

জলবায়ু ন্যায্যতা এবং সংহতি সমাজ ভিত্তিক মানবিক অভিযোজন

জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় সংহতি সমাজ ব্যবস্থার অপরিহার্যতা



এস জাহাঙ্গীর হাসান মাসুম
বি, আর. খান

eed Evangelischer Entwicklungsdienst

CDP Promoting Peace & Progress

জলবায় ন্যয্যতা এবং সংহতি সমাজ ভিত্তিক মানবিক অভিযোজন

জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় সংহতি সমাজ ব্যবস্থার অপরিহাযর্তা

রচনায় ঃ

এস জাহাঙ্গীর হাসান মাসুম
বি, আর. খান

গবেষণা সহযোগী ঃ

আতিকুর রহমান টিপু

এম এম মাহবুব হাসান

মিহির বিশ্বাস

সোমা দাস

খোকন সিকদার

অক্ষর বিন্যাস ঃ

মুক্তা রানী বিশ্বাস

মোঃ জামাল হোসেন হাওলাদার

প্রকাশনায় ঃ কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ

যোগাযোগঃ

মুদ্রণে ঃ

মূল্য ঃ ২০০ (দুইশত) টাকা মাত্র।

(এই পুস্তক বিক্রিত অর্থ জলবায়ু বিষয়ক সচেতনতা মূলক প্রকাশনায় এবং সংবাদ কর্মীদের প্রশিক্ষাণে ব্যয় হবে)

পৃথিবীর উপরিভাগে প্রায় বিশমাইল উর্দ্ধে পর্যন্ত্ম বায়মন্ডল। এই বায়ুমন্ডলের কাজ হল সূর্যের কিরণ থেকে তাপ এবং অতিবেগুনী রশ্মি ফিল্টার করে আমাদের সহ অন্যান্য প্রাণী এবং গাছপালা বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশন করা হয়। বায়ুমন্ডল দিনের পর দিন শুধু গরমই হচ্ছে। এই গরমে মেরন্ন অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে। বড় বড় পর্বত ছড়ার বরফ গলে যাচ্ছে। এই বরফ গলা জল সাগরে জলের পরিমান বাড়িয়ে তুলছে।

বৈশ্বিক উষ্ণতার বিষয়টা এখন আর সেই পর্যায়ে নেই যে কোন ফালতু মতবাদ বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলাম। জলবায়ু পরিবর্তন গণমানুষের জীবন ধারায় যে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে বা পরিবর্তনের সূচনা দেখা যাচ্ছে তাকে অস্বীকার করে কালক্ষেপন করার সুযোগ বা সময় কোনটাই নেই।

জলবায়ু পরিবর্তন প্রশ্নে ঘন জনবসতিপূণ বাংলাদেশ পৃথিবীতে সবচেয়ে ঝুঁকি পূর্ণ দেশগুলোর তালিকায় প্রথম দিকে। আমরা বিভিন্ন ভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইতোমধ্যেই টের পেতে শুরন্ন করেছি। বাঁচার তাগিদেই, গরিব জনগণের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সাথে খাপখাইয়ে নেওয়া ছাড়া গত্যন্ত্মর নেই। বর্ষাকাল অথচ বৃষ্টি নেই। ফসল ফলানোর জন্য যে বৃষ্টির দরকার আমাদের তা আর এখন সময় মত হয়না বলে ফসল ফলানো মুশকিল হয়েছে। আমাদের বেঁচে থাকার তাগিদেই একত্রিত থাকতে হবে।

মানুষের মাঝে, গণমানষের মনে ঐকব্দদ্ধ সংহতি মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনে নীতিগত ব্যবস্থা গ্রহনের আশ্রয় নিতে হলে তা বাধ্যতামূলকভাবেই নিতে হবে। সংহতি সমাজ ব্যবস্থার মাঝেই, স্বয়ম্ভরতা অর্জনের চাবিকাঠি, সংহতি-অর্থনীতির বীজ লুকায়িত আছে। অনুকূল পরিবেশে অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতকে হিসাবে রেখেই গণসচেতনতা থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতিগুলো মোকাবিলা এবং অভিযোজন সহায়ক কর্ম পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট খুটিনাটি বিষয়াদিও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

অধ্যায় ১

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব



'পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলি আগামী দিনগুলিতে খুব বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পতিত হবে"

-জাতিসংঘ মহাসচিব বান কী মুন

১. জলবায়ু পরিবর্তন এবং আগামী পৃথিবী

সম্প্রতি জাতিসংঘ মহাসচিব বান কী মুন এক বিবৃতিতে উলেস্নখ করেছেন 'পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলি আগামী দিনগুলিতে খুব বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পতিত হবে"। কিন্তু কেন? কারণ আর কিছুই নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে। বাড়ছে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিঘ্নিত হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। অনেক লোকের ধারনা এই ব্যাতিক্রমী তাপ বৃদ্ধির ব্যাপারে মানুষের কোন হাতই নেই। থাকতেই পারেনা। এই বিপুলা ধরনীকে মানুষে আর কতটুকু ক্ষতি করতে পারবে? ধর্মে বিশ্বাসীরা তো এক বাক্যে বলে দেবে এ স্রষ্টার কান্ড কারখানা। মানুষের কাজ হচ্ছে সহ্য করে নেওয়া । অথচ তারা এটা ঘুনাক্ষরেও কল্পনা করতে অক্ষম যে এই বিশাল পৃথিবী পৃষ্ঠের উপরে বিশ মাইল উর্দ্ধব্যাপী বায়ুমন্ডল ১৭৫০ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কার্বণ-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস দিয়ে আস্তে আস্তে ভরে ফেলেছে। তখন থেকেই মানুষ এই দূষণ প্রক্রিয়ার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে বলে অভিযোজনের ধারাটা পরবর্তী প্রজন্মদের রক্তধারায় মিশে গিয়েছে। তাই বুঝতে পারছেনা কী ভাবে কি ঘটে চলছে। বিগত দশ হাজার বছরে মানুষের যে অগ্রগতি হয়েছে তার চেয়ে অনেকবেশী অগ্রগতি হয়েছে বিগত ১০০/১৫০ বছরে। এই শিল্প বিপস্নবএর পথ ধরেই পিছু নিয়েছে পৃথিবী নামক গ্রহটার চরম পরিনতি। অনেক ধরনের পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে তখন থেকেই।

কোন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বায়ুর চাপ, প্রবাহের দিক, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির দৈনন্দিন বা অল্প কয়েকদিনের (সাধারণত ১ থেকে ৭ দিনের) বিবরণকে আবহাওয়া বলা হয়ে থাকে। আবহাওয়ার প্রধান উপাদানগুলি হল ১. জলীয় বাস্পের উপস্থিতি ও ঘনত্ব ২. বায়ুর চাপ ৩. বায়ুর তাপমাত্রা ৪. মেঘের ঘনত্ব ও মেঘের প্রকৃতি ৫. বায়ু প্রবাহ ও বায়ুর গতিবেগ ৬. বৃষ্টিপাত প্রভৃতি। আবহাওয়া ও জলবায়ুর অবস্থা দ্বারা একটি অঞ্চলের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রাকৃতিক বিবরণ পাওয়া যায়।

জলবায়ু বলতে একটি অঞ্চলের আবহাওয়ার দীর্ঘদিনের সাধারন অবস্থার বিবরণকে বুঝায়। কোন স্থান বা অঞ্চলের দীর্ঘকালের (নুন্যতম ৩০ বছরের) দৈনন্দিন আবহাওয়া পর্যালোচনা করে বায়ুমন্ডলে ভৌত উপাদানগুলির (অর্থাৎ বায়ুর তাপ, চাপ, বষ্টিপাত, আদ্রতা প্রভৃতির) যে সাধারণ অবস্থা নির্ধারণ করা হয় তাকেই ঐ স্থানের বা অঞ্চলের জলবায়ু হিসেবে গন্য করা হয়। এ ক্ষেত্রে একটি অঞ্চলের নূন্যতম তিন দশকের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহের দিক, বায়ুর গতিবেগ, আদ্রতা মেঘাচ্ছন্নতা প্রভৃতির গড়কে ঐ স্থানের জলবায়ু হিসেবে ধরা হয়। যেমনঃ বাংলাদেশে জুন-জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে গত ৩০ বছরের বৃষ্টিপাতের গড়, বর্ষা ঋতুতে এ দেশের জলবায়ু সাধারণ অবস্থা প্রকাশ করে থাকে। উপরের আবহাওয়া ও জলবায়ুর আলোচনা দেখলেই অনুধাবন করা যায় যে, এ দুটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

সম্প্রতি ২৯/৫/২০০৯ তারিখে প্রকাশিত লন্ডন ভিত্তিক সংগঠন, দি গেস্নাবাল হিউমানিটারিয়ান ফোরাম- এর এক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দেখা যায় যে প্রতি বছর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে প্রায় ৩ (তিন) লক্ষ্য লোক মৃত্যুবরণ করে এবং ১২৫ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিসাধন হয়। ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে ৩২ কোটি লোক হচ্ছে অত্যন্ত গরীব দেশের অধিবাসী। রির্পোটে উলেস্নখ করা হয় যে, বাংলাদেশে প্রতিবছর বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে লক্ষ লক্ষ উপকূলীয় গরীব মানুষ, উগান্ডায় কৃষকেরা প্রচন্ড খরায়, ক্যারিবিয়ান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহে সমুদ্র জলের মাত্রা বৃদ্ধিও ফলে অগনিত মানুষ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এ সকল দেশ পৃথিবীতে এক শতাংশ কার্বণও ছড়ায় না। অথচ তারাই হচ্ছে কার্বণ দূষনের শিকার।

পৃথিবীর পূর্বের ইতিহাস পর্যালোচনায় সাগর/মহাসাগরের বিভিন্ন সময়ে উলেস্নখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সাগরের উচ্চতা ১২ সেঃমিঃ এবং ২১০০ শতকের শেষ নাগাদ ৫০ সেঃ মিঃ বৃদ্ধি পাওয়া খুবই স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া যায় বলে বিভিন্ন গবেষকগণ উলেস্নখ করছেন। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরুন্ন অঞ্চলের হিমবাহ বা বৃহৎ বরফ খন্ড গলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বরফ গলনের ফলে অতিরিক্ত পানি মহাসাগরে এবং সাগরে ধাবমান হবে এবং সাগর মহাসাগরের পানির উচ্চতা সঙ্গত কারনে বৃদ্ধি পাবে। সাগর মহাসাগরের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে পৃথিবীর উপকূলীয় দেশসমূহ যথা : বাংলাদেশ, ইন্দ্রোনেশিয়া, মালদ্বীপ, নেদার ল্যান্ড, শ্রীলংকা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে, যদিও এগুলো বাস্তবে কি পর্যায়ে ঘটবে তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছেনা ।

১.১. জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে

পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বায়ুমন্ডলের ওজন স্তরের ক্ষতি সাধন বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের জন্যই বর্তমানে উদ্বেগের বিষয় এবং সামগ্রীক পরিবেশের প্রতি মারাত্নক হুমকি হিসেবে দেখা দিচ্ছে। বিগত প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ডের ফলে এই হুমকি দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। মানুষের স্থাপিত কলকারখানা ও কর্মকান্ড এবং বন এলাকা কমে যাওয়ার কারনে বাতাসে কার্বণ-ডাই-অক্রাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ এলাকা সমপ্রসারনের ফলে বাতাসে মিথেন গ্যাসের পরিমাণও বাড়ছে এবং একই সাথে যোগ হচ্ছে অন্যান্য গ্রীণহাউস গ্যাসের সম্প্রসারিত উদগীরন। ফলে পৃথিবীর উত্তাপ বাড়ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে জলবায়ু এবং ঘনিয়ে আসছে দূর্যোগ। এ সবই এখন বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং তাই সবার দৃষ্টি আবর্তিত হচ্ছে তা নিবারনের উপায় উদ্ভাবনে এবং পৃথিবীকে রক্ষার জন্য।

১.২. গ্রীণহাউস প্রতিক্রিয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তন

গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া এখন বিশ্বব্যাপী একটি অন্যতম বহু আলোচিত বিষয়। গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া বর্তমানে বিশ্বব্যাপী একটি সার্বজনীন সমস্যা এবং প্রতিটি দেশের জন্যই চিন্তার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আলোচনার প্রথমেই প্রসঙ্গক্রমে চলে আসে গ্রীণহাউস বলতে কি বুঝায় এবং প্রতিক্রিয়া সমূহ কি ধরনের। সাধারনভাবে বলতে গেলে এটুকু বলা যায় যে, শীত প্রধান দেশে অতিরিক্ত শীতের কারনে কম তাপমাত্রায় কৃষি কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হয় বিধায় স্বচ্ছ আচ্ছাদন বিশিষ্ট আবদ্ধ ঘরে মূলত সবজি জাতীয় ফসল আবাদ করা হয়ে থাকে। স্বচ্ছ আবদ্ধ (কাচেঁর ঘর) ঘরে সূর্যের রশ্মি সহজেই ঢুকতে পারে কিন্তু প্রতিফলিত রশ্মি কাচেঁর দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারে না বিধায় ভিতরের তাপমাত্রা আস্তে আস্তে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ঘরটি বাহিরের তুলনায় অনেকটা উষ্ণ করে তোলে এবং একেই গ্রীণহাউস প্রতিক্রিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অনুরূপ ভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠে সূর্য রশ্মি আসার পর বিভিন্ন কারনে প্রতিফলিত রশ্মি নিকট ভূ-পৃষ্টে আটকে যাওয়ার কারনে আস্তে আস্তে ভূ-পৃষ্টের আপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং বিভিন্ন তাপমাত্রা তথা পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি, আবহাওয়াগত পরিবর্তন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবর্তন নিয়ে আসছে যাকে আমরা গ্রীণহাউস প্রতিক্রিয়া হিসেবে সাধারন ভাবে আখ্যায়িত করছি। গ্রীণহাউস প্রতিক্রিয়ার নানাবিধ কারন রয়েছে, যার মধ্যে শিল্প কর্মকান্ডের প্রসার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অতিরিক্ত খাদ্য চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনে সেচকৃত আবাদী জমির পরিমান বৃদ্ধি অন্যতম। বনভূমির অতিরিক্ত ধ্বংস সাধন ও একটি প্রধান কারন।

আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সাগরের উচ্চতা ১২ সেঃমিঃ এবং ২১০০ শতকের শেষ নাগাদ ৫০ সেঃ মিঃ বৃদ্ধি পাওয়া খুবই স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া যায় বলে বিভিন্ন গবেষকগণ উলেস্নখ করছেন।

গ্রীনহাউজ গ্যাসসমূহের জীবনকাল, আনুপাতিক শোষণ ক্ষমতা এবং গ্রীনহাউজ প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা

গ্রীনহাউজ গ্যাসসমূহ	জীবনকাল (বৎসর)	আনুপাতিক শোষণ ক্ষমতা (ইউনিট ভর)	গ্রীণহাউজ প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা	
			২০ বৎসর	৩০বৎসর
কার্বণ-ডাই-অক্রাইড	১২০	১	১	১
মিথেন	১০	৫৮	২৬	২
নাইট্রাস অক্রাইড	১০০	২০৬	২৭০	১৯০

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন এবং কৃষি কর্মকান্ডের বিস্তৃতির ফলে গ্রীণহাউস গ্যাসের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে যা ভু-মন্ডলীয় উচ্চতা বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ্যভাবে কাজ করছে। কোন একক দেশের পক্ষে এ সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব নয় এবং এজন্য বিশ্বব্যাপী গ্রীণহাউস গ্যাসের উদগীরন কমানোর বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। জনসংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে মানুষের বিভিন্নমুখি চাহিদা মিটানোর জন্য সঙ্গত কারণে গ্রীণহাউস গ্যাসের নিঃসরণ দিন দিন বাড়ছে। নিম্নে গ্রীণহাউস প্রতিক্রিয়ার কারণসমূহ উলেস্নখ করা হলো ঃ

- শিল্পায়ন ও অন্যান্য যান্ত্রিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির ফলে বাতাসে কার্বণ-ডাই–অক্রাইড (CO_2) এর পরিমাণ বৃদ্ধি।
- সেচ প্রযুক্তি বিকাশের ফলে সেচকৃত এলাকা হতে বাতাসে মিথেন গ্যাস (CH_4) নির্গত হওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি।

- শিল্পায়ন, যান্ত্রিক যানবাহন ও অন্যান্য যান্ত্রিক কর্মকান্ডের বাতাসে নাইট্রাস অক্সাইড(N_20) ও কার্বণ মনোঅক্সাইড(CO) গ্যাস এর পরিমাণ বৃদ্ধি।
- বিভিন্ন ইলেকট্রিক যন্ত্রাদিতে ক্লোরোফ্লোরোকার্বণ ও ওজোন গ্যাস ব্যাবহারের ফলে বায়ুমন্ডলে এর পরিমাণ বৃদ্ধি।
- বিভিন্ন কারনে গ্রীণহাউস নিঃসরনের মাধ্যমে বায়ুমন্ডলের ওজন স্তরের ক্ষয় সাধন ইত্যাদি।

গ্রীণহাউস গ্যাসের পরিমাণ বায়ুমন্ডলে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীগণ আগামী ৫০ বৎসরের ভূ-পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা এক হতে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে বলে হুশিয়ারি উচ্চারন করেছেন।

১.৩. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ভয়াবহ দূর্যোগের পথে আগামী পৃথিবী

তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাবে পৃথিবীর সর্বত্র জমাটবাধাঁ বরফ ক্রমবর্ধমানভাবে গলে যাচ্ছে । পাহাড়গুলোতে বরফ ধ্বস নামছে এবং মেরুন্ন অঞ্চলগুলোতে ও সমুদ্রে জমাটবাধাঁ বরফে পরিবর্তন ঘটছে। দ্রুনত বরফ গলে যাওয়া এবং বৃষ্টির প্রকোপ বাড়ার কারনে বদলে যাচ্ছে জলপ্রবাহের উচ্চতার পর্যায় এবং জলের গুনগত মান। এবং ক্রমবর্ধমান উষ্ণতাবৃদ্ধি ও সমুদ্রস্ফীতির ফলে উপকূলীয় এলাকাসমূহ উচ্চ ঝুঁকির সম্মুখিন এবং জীব-বৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। কৃষি (খাদ্য, শস্য, আঁশ ইত্যাদি), বন সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, শিল্প সম্পদ, মানুষের স্বাস্থ্য, বাসস্থানসহ আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঝুঁকি ক্রমবর্ধমান। মোট কথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবন ধারন বিভিন্ন ধরণের বিরন্নপ প্রভাবের মুখোমুখি এবং তা আগামী দিনগুলোতে বাড়তেই থাকবে, বিশেষ করে যদি অর্থনৈতিক ও সংশিস্নষ্ট কর্মকান্ড এবং মানুষের জীবন-যাপন যেভাবে চলে আসছে সেভাবেই চলতে থাকে।

- ✓ ১৮৯৯ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত মোট তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৭৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং ১৯৯০ থেকে ২১০০থেকে২১১০ সাল পর্যন্ত ভু-পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা ১.৪০ থেকে ৫.৮০সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে।
- ✓ শিল্পায়নপূর্ব সময় থেকে অত্যাৎ আটারো শতক তেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বায়ুমন্ডলে কার্বণ-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে ২৮০ থেকে ৩৭৯ পিপিএম পর্যন্ত এবং ২১০০ সাল নাগাদ বাতাসে কার্বণ-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫৪০ থেকে ৯৭০পিপিএম।
- ✓ জলবায়ু পরিবর্তন বৃদ্ধি পেতে থাকলে ঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যাসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পেতে থাকবে।
- ✓ মানুষের জীবন-যাত্রা এবং অর্থনীতির উপর জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব সবচেয়ে মারাত্মক। বিশ্বের প্রায় ২৫ মিলিয়ন মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে।
- ✓ ৩০ বছরের মধ্যে হিমালয়ের বরফের ৫ ভাগের ৪ ভাগই গলে যেতে পারে। এ সময়ে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়তে পারে ০.০৯ থেকে ০.৮৮ মিটার পর্যন্ত।
- ✓ ২০৫০সালের মধ্যে বিশ্বে ধানের উৎপাদন কমবে ধান ৮ ভাগ ও গম ৩২ ভাগ।
- ✓ তাপমাত্রা দেড় থেকে আড়াই ডিগ্রী সেলসিয়াস বাড়লে এ শতাব্দীতে প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতিগুলোর এক তৃতীয়াংশ হুমকির মুখোমুখি হতে পারে বলে জাতিসংঘের আশংকা।
- ✓ এশিয়ার বন্যা, খরা ও বিশুদ্ধ পানির অভাব তীব্র হয়ে উঠবে। রেহাই পাবেনা অন্য দেশগুলোও।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে শুধু যে সাইক্লোন, বন্যা, খরা বাড়বে তা নয় সে সাথে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সম্পদ ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। বিপর্যয়ের সম্মুখিন হবে কৃষি ও মৎস খাত। কৃষি হচ্ছে পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান। কৃষি উৎপাদনকে যুগ যুগ ধরে প্রভাবিত করেছে নিত্য নতুন প্রযুক্তি, অভিনব চিন্তাধারা, গবেষণালব্ধ উদ্ভাবন এবং বিভিন্ন সময়ে জলবায়ুর পরিবর্তন। জলবায়ুর পরিবর্তন কৃষি এবং কৃষি প্রধান দেশগুলোকে অধিক মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বৈজ্ঞানিক তথ্য উপাত্ত প্রমান করেছে যে উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে উচুঁ মাত্রায় ঝুঁকির সম্মখিন অর্থ্যাৎ এই দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য বিরন্নপ প্রভাবের প্রথম সারিতে রয়েছে। কিন্তু উদ্ভূত অবস্থা মোকাবেলা করার ক্ষমতা তাদের খুবই সীমিত। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি পৃথিবীর সেই সমস্ এলাকায় বিশদভাবে দেখা দিবে যেখানে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা (যেমন ঘনবসতি, অর্থনৈতিক অতি দূর্বলতা, নিম্নস্তরের মানব সক্ষমতা, প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতা এবং অব্যবস্থা, ভূমির মানের অবনয়ন, বিশ্বায়ন-উদ্ভুত আর্থ-সামাজিক সমস্যা, এমনিতেই নানান ধরণের অসুখ বিসুখের প্রাদুর্ভাব রয়েছে।

১.৪. বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

বিশ্বের অনুন্নত বা উন্নয়ন কামী দেশগুলোর বাসিন্দারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত্ব হবার ঝুঁকি নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। গোটা পৃথিবীর দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থা জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রক্রিয়া প্রভাবিত দেশ হিসেবে- চরম ঝুঁকি পূর্ণ। আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের হুমকির মুখে আছি প্রতিদিন, প্রতি মুহুর্তে। এ দেশটা ঘন জনবসতি পূর্ণ। তাই ক্ষতির মাত্রাটা বাংলাদেশের জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের। চরম ক্ষয়ক্ষতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ জরবায়ু পরিবর্তনের এক নম্বর শিকার। বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান এমন যে দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে সৃষ্ট সাইক্লোন, টর্নেডো যেমন বিগত দিনে আঘাত হেনেছে, তেমনই সামনের দিনগুলো তো আরও ভয়াবহ।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

- ✓ শুকিয়ে যাচ্ছে নদ-নদী ও জীবন
- ✓ বেড়েছে তাপমাত্রা ও তাপপ্রবাহ
- ✓ বাড়ছে লবণাক্ততা
- ✓ বাড়ছে সমুদ্রপৃষ্ট ও জোয়ারের উচ্চতা
- ✓ জীববৈচিত্র্যের উপর প্রভাব পড়ছে
- ✓ জীবন ও জীবিকার উপর প্রভাব পড়ছে
- ✓ পেশা ও জীবিকার ধরণ পাল্টে যাচ্ছে

আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা প্রায় ১.৫০ হতে ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা করা হচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে দেশের খরাকবলিত এলাকার পরিমান বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং একই সাথে বৃষ্টি পাতের তারতম্য ঘটবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। পরিবেশবিদেরা বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত্ব হবে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা। তাদের মতে এসব এলাকায় সাইক্লোনের তীব্রতা ও সংখ্যা বেড়ে যাবে। পানি ও মাটির লবণাক্ততা বেড়ে সহনীয় মাত্রা অতিক্রম করবে। বেড়ে যাবে লবণাক্ততার স্থায়িত্ব। উত্তাল সাগরে জেলেরা নিরাপত্তাহীন হয়ে উঠবে।

বাংলাদেশের ভিতরে বহু নদী প্রবাহমান এবং উপকুলীয় এলাকার মাধ্যমে সাগরে পতিত হয়েছে। প্রতি বছর ২ সেঃ মিঃ সাগরে পানির উচ্চতা বৃদ্ধিতে উপকুলীয় তটভূমি ২-৩ মিটার হারে কমে যাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এভাবে ২০৩০ সালের মধ্যে ৮০-১২০ মিটার তটভূমি সমুদ্রে হারিয়ে যেতে পারে এবং দেশের গুরন্নত্বপূর্ণ পর্যটন স্থান দুটি হুমকির মুখে পড়তে পারে। বাংলাদেমে বর্তমানে প্রায় ৬ ভাগ লোক তটবূমির নিকটভূমির নিকটতম স্থানে বসবাসরত এবং এ জনগোষ্ঠী প্রাথমিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত্ব হবে। খারাপ অবস্থায় সাগরের উচ্চতা ১মিটার বৃদ্ধি পেলে আরও ২৫,০০০ হাজার বর্গ কিঃমিঃ এলাকা লবণাক্ত পানিতে তলিয়ে যাবে এবং দেশের প্রায় ৩৫ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বে যা বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় মোকাবেলা করা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

দেশীয় বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বের গড় তাপমাত্রা দশমিক ৫ডিগ্রী থেকে ২ডিগ্রী বাড়লে বাংলাদেশ সংলগ্ন সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বাড়বে ১০ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার। এতে দেশের উপকূলের ১৫ ভাগ ভূমি পানির নিচে তলিয়ে যাবে। মোট ৭৫০কিলোমিটার এই উপকূলীয় এলাকা তলিয়ে গেলে এ অঞ্চলের ২ কোটি অধিবাসী পরিণত হবে জলবায়ু উদ্ধাস্তুতে । ২০০৭ সালের প্রকাশিত আইপিসিসি প্রকাশিত এক রির্পোটে বলা হয়েছে, সর্তকতামূলক ব্যবস্থা না নিলে ৫০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের গর্ব সুন্দরবন বিশ্বের মানচিত্র থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও বিপন্নতা মোকাবেলা করতে ৬টি ধাপে একটি প্রক্রিয়ার ধারণা দেয়া যায়

১. জলবায়ু ঝুঁকি নিরূপণ
২. গুরন্নত্ব নির্ধারণ ও পরিকল্পনা গ্রহন
৩. সচেতনতা বৃদ্ধি
৪. অভিজ্ঞতা ও তথ্য বিনিময়
৫. জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কর্মকৌশল নির্ধারণ
৬. বৈশ্বিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের বিপন্নতা উপস্থাপন

বিশেষজ্ঞগন উপকূলীয় অঞ্চলে ঝুঁকি কমাতে অভিযোজন কৌশল সুপারিশ করেছেন। সেগুলো নিম্নে দেওয়া হলোঃ

- ✓ উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ;
- ✓ হাঁস পালন;
- ✓ ভাসমান বাগান করতে স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ✓ লবণাক্ততা সহনীয় ফসল চাষ;
- ✓ রিং ভিত্তিক ঝুলন্ত্ম বাগান সম্প্রসারণ;
- ✓ বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ;
- ✓ লবণাক্ত এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা;
- ✓ ঘূর্ণিঝড় সহনীয় বাড়ি তৈরী করা;
- ✓ সাগরের প্রতিকূল আবহাওয়া সহনীয় নৌকা তৈরী ;
- ✓ মাছ ধরতে যাবার সময় জেলেদের নৌকায় রেডিও রাখার ব্যবস্থা করা;

জলবায়ু পরিবর্তনে খাপ খাওয়ানো ও ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের যা করণীয়ঃ

- ✓ পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয় ও প্রজাতন্ত্রেও কর্মকর্তাদের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- ✓ জলবায়ু পরিবর্তনে খাপ খাওয়ানো ও প্রভাব নিরূপনের প্রাপ্ত তথ্য ও জ্ঞান বৃদ্ধিকরণ যা বর্তমানে গবেষণালব্ধ ফল একত্রিতকরণ ও সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণে বিজ্ঞানী ও পলিসি মেকারদের তথ্য আদান-প্রদানে উন্নয়ন সাধন করবে।
- ✓ সচেতনতা বৃদ্ধি, সরকারি সংস্থা, এনজিও, নাগরিক সমাজ এবং অন্যান্য খাত এ বিভিন্ন কৌশল ও তথ্য উপাদান ব্যবহার করে এ্যাডভোকেসি এবং সমন্বয় সাধন করা। জলবায়ু সংশিস্নষ্ট খাত ও দুর্যোগে ঝুঁকি কমানোর পদ্ধতিতে জলবায়ু পরিবর্তনে খাপ খাওয়ানো ও ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে এবং সার্বিক উন্নয়নে ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল কাজ করবে।
- ✓ জলবায়ু পরিবর্তন ও সংশিস্নষ্ট ঝুঁকি বিষয়ে জ্ঞানের বিকাশ;
- ✓ ঝুঁকি সম্পর্কে নীতি-নির্ধারক ও পরিকল্পনাবিদদের সচেতন করে তোলা;
- ✓ জলবায়ু পরিবর্তনে মডেলিং সেন্টার গড়ে তোলা;
- ✓ অন্যান্য সংস্থার সাথে জলবায়ু বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বিনিময় করা;

১.৫. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ মোকাবিলায় নুন্যতম কর্মসূচি

ঘন জনবসতিপূর্ণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মারাত্মক এবং সাংঘাতিক ঝুঁকি সমূহের হুমকির মুখে বাংলাদেশ। আমরা ইতিমধ্যে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া জলবায়ু পরিবর্তনের হিংস্র থাবাগুলো প্রত্যক্ষ করেছি। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এর অনির্ধারিত এবং অতিমাত্রার ছোবলগুলো সর্ম্পকে মোকাবিলা করার মত আমাদের ধারণা, শক্তি সামর্থ, সম্পদসহ অনেক কিছুই অপ্রতুল। সে হিসেবে আমাদের সামনে নুন্যতম কর্মসূচি রূপে যে ব্যবস্থা অবস্থান করছে তা হল নিম্নরূপঃ

- ✓ গণমানুষকে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে ত্বরান্বিত ভাবে সচেতন করার জোরালো কর্মসূচী হাতে নেওয়া।
- ✓ জলায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট মোকাবিলায় সরকারী বেসরকারী অবকাঠামোগুলো এমনভাবে কর্মক্ষম করে তোলা যাতে স্থানীয়ভাবেই ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়।
- ✓ দূর্যোগ মোকাবিলা করার শক্তিগুলোকে আরও শক্তিশালী কাঠামোতে পরিণত করা।
- ✓ কেন্দ্রীয়ভাবে এবং ধাপ অনুযায়ী সাহায্য সহযোগিতার "জরুরী অবস্থা" সুসংহত রাখা এবং তাৎক্ষনিকভাবেই কার্যকরী ভূমিকা পালনে "সদাপ্রস্তুত" অবস্থায় রাখা। মনে রাখতে হবে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহনে বা সহায়ক ভূমিকা পালনে শৃঙ্খলা বোধ থাকবে তুখোড় পর্যায়ের।

- ✓ উদ্বাস্তুদের জন্য জরুরী সাহায্য কেন্দ্র, বহুতল আবাসন এবং মৌলিক চাহিদা মেটাতে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ✓ তাৎক্ষণিক আশু, স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন। এটা এমনভাবে করা দরকার যাতে স্থানীয়ভাবে এইসব পরিকল্পনার কার্যকরী প্রতিফলন ঘটাতে কালক্ষেপন না হয়।
- ✓ বেকার হাতগুলোকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো যাতে সেগুলো নিজেদের ভরণপোষণে পরমুখাপেক্ষি না হতে হয়।
- ✓ ঘাটতি খাদ্য সম্পূরক ব্যবস্থায় বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় খাদ্য আমদানী নীতি বদলানো দরকার। এটা বাধ্যতামূলকভাবেই করতে হচ্ছে। স্বয়ম্ভরতা অর্জনে শস্য উৎপাদন ব্যবস্থায় সংশিস্নষ্ট বিশেজ্ঞদের সার্বিক সহায়তার মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার অভিযানে নামতে হবে। পৃথিবী যেখানে খাদ্য ঘাটতিতে ভুগছে - সেখানে সাহায্য পেলে ভাল, তবে সাহায্যের আশায় বসে না থাকা আরও ভাল।
- ✓ আবাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন অপরিহার্য। গুচ্ছ আবাসন ব্যবস্থায় ভূমি পুনরুদ্ধার সম্ভব গতানুগতিক বাপ-দাদা আমলের চিন্ত্মা চেতনায় রক্ষনশীল মনোভাব সামাজিক জীবনবোধ বিড়ম্বিতই করবে। সুতরাং এ সর্ম্পকে গণসচেতনতা বাড়াতে হবে, ব্যক্তি স্বার্থ জলাঞ্জলী দিতে হবে। সমষ্টিগত চিন্ত্মার প্রসার ঘটাতে হবে। নতুন কাঠামোয়, নতুন জীবন ধারায়, নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন অপরিহার্য। এটা সময়ের দাবী। সময় না বলে বরং দুঃসময় বলা সমীচিন। সুতরাং এ ব্যবস্থা দুঃসময়ের দাবী।
- ✓ মানুষের মাঝে, গণমানুষের মনে ঐকদ্দ্ধ সংহতি মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনে নীতিগত ব্যবস্থা গ্রহনের আশ্রয় নিতে হলে তা বাধ্যতামূলকভাবেই নিতে হবে। তবে মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে নিজের ভালো, প্রজন্মদের কল্যাণ কীভাবে হবে তা বুঝতে পারবে।
- ✓ সংহতি সমাজ ব্যবস্থার মাঝেই, স্বয়ম্ভরতা অর্জনের চাবিকাঠি, সংহতি-অর্থনীতির বীজ লুকায়িত আছে। অনুকূল পরিবেশে অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে।

উলেস্নখিত সবগুলো বিষয়ই জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সংকট মোকাবিলা এবং অভিযোজন প্রক্রিয়ার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা একক ভাবে সংকট নিরসনে সাফল্য লাভ করবে, এমনটা আশা করা সমীচিন বলে বিবেচিত হওয়ার দাবি করতে সমর্থ নয়। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টাই ব্যাপকতা ভিত্তিক। সে ক্ষেত্রে একক প্রচেষ্টা যতই নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত হোক না কেন ব্যাপকতার আঘাতে সে পরিকল্পনা সীমিত রাখা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

জলবায়ু পরিবর্তন মানুষের বেঁচে থাকার জরুরী অবস্থা মোকাবিলা, বিপর্যয় এড়ানো, প্রতিকূলতাকে অনুকূলে আনতে ইত্যাদি বহু ধরনের সমস্যা এবং অনিশ্চিত সম্ভাব্যতার জনক। সে ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের সৃষ্ট সংকট সহ বৈশ্বিক উষ্ণতার চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টা অকল্পনীয়ভাবেই গুরুতর। এখানে বাঁচা মরার প্রশ্ন। তাই এর গুরুত্বও অত্যান্ত্ম ভারী। বাংলাদেশের মানুষ শুরু থেকেই অভিযোজন অভ্যান্ত্ম, সে হিসেবে স্থানীয়ভাবে সমস্যা মোকাবিলায় তাদের মতামতকে গ্রহণ করতে হবে শ্রদ্ধার সাথে।

অধ্যায় ২

জলবায়ু নিরাপত্তাহীনতা ও অভিযোজন



“আমরা আমাদেও পূর্ব পুরুষদের নিকট হতে এই পৃথিবীটা পাইনি আমরা আমাদের সন্তানদের নিকট থেকে ধার করেছি মাত্র।”

- আমেরিকান আদিবাসী প্রবাদ

২. পরিবর্তনশীল জলবায়ুর সাথে মানুষের অভিযোজনের ইতিহাস

জলবায়ু সংক্রান্ত জাতিসংঘের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে "জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার বৃদ্ধি এবং ভূমির ব্যবহার পরিবর্তন পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে বর্ধিত পরিমানে গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গত করেছে এবং এখনও করছে। এই গ্রীণ হাইস গ্যাস গুলোর মধ্যে রয়েছে কার্বণ-ডাই অক্সাইড, মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড।এই গ্যাসগুলো বায়ুমন্ডলে তাপের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ু পরিবর্তন হয়।

আই.পি.সি.সি-এর ২০০৭ এর প্রতিবেদনে নতুন তথ্য হচ্ছে বিগত ২বছর যাবৎ সমুদ্রের জমাকৃত বরফ অস্বাভাবিক হারে গলছে। বরফ সাগরের পানির তাপমাত্রা অক্টোবরে স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণ । যাতে প্রতীয়মান হয় যে পরবর্তীতে শীত কালীন বরফ অনেক হালকা হয়ে যাবে , এই প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন চলতে থাকলে বরফ গলে পানির পরিমান বৃদ্ধি পাবে ফলে সমুদ্র পৃষ্টের উচ্চতা বাড়বে।
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান বৈশিষ্টগুলোর মধ্যে রয়েছে বৈশ্বিক তাপমাত্রার গড় বৃদ্ধি, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, মেঘের আবরনের পরিবর্তন এবং ভূমিধ্বস, হিমবাহের গলে যাওয়া এবং তুষার আবরনের ক্ষয়প্রাপ্তি। সাগরের পানির তাপমাত্রা এবং লবনাক্ততা বৃদ্ধি। এ সবই হয়েছে সাগরের পানি বায়ুমন্ডল থেকে তাপ এবং আবহাওয়া থেকে কার্বণ-ডাই-অক্সাইড শুষে নেওয়ার কারনে। জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বব্যাপী গরমের মাত্রা বৃদ্ধি বা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ঘটানোর পেছনে রয়েছে মানুষের তৈরী গ্রীণ হাউস গ্যাসের নির্গমন (প্রধানত: কার্বণ-ডাই-অক্সাইড)।

২.১. জলবায়ু ন্যয্যতা

"আমরা আগামীকেই আজ মোকাবেলা করছি। আমরা সময়কে তার গতি স্দ্ধ করতে কান্নাকাটি করতে পারি কিন্তু সময়ের পতিটি মুহুর্ত অতি নির্মম এবং নিষ্ঠুর"- মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র সামাজিক ন্যায় বিচার সম্পার্কত এক বক্তব্যে চার দশক আগে উক্ত মন্ব্যটি করেছিলেন। প্রখ্যাত ড: কিং এর বক্তব্য সূত্রে আমরা এটি বলতে পারি যে,গতকালের সামাজিক ন্যয্যতাই আজকের জলবায়ু ন্যয্যতা ।

জলবায়ু পরিবর্তনকে শুধুমাত্র পরিবেশগত বিষয়রূপে চিহ্নিত হতে না দিয়ে, অবশ্যই সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রশ্ন হিসেবে উপলব্ধি করতে হবে, এর কারণগুলো নিহিত রয়েছে চলতি পুঁজিবাদ-নিয়ন্ত্রিত বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যা নীতিগতভাবেই ব্যক্তি উদ্যোগে নির্মম মুনাফা অর্জন তাড়িত এবং পুজি সম্পদ সঞ্চয়ের প্রতিযোগিতা। আজকের জলবায়ু ন্যয্যতা হলো জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সংকট এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ন্যায্যতায় জনগনের ক্ষমতায়ন। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হুমকরি মুকে, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ হবার সম্ভাবনায রযেছে ভূমিহীন, দরিদ্র এবং বিচ্ছিন্ন জনগন। সামাজিক পেক্ষাপটে জনসংখ্যা এবং জনঘনত্ব জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সংকট ঝুঁকি বাড়িয়েই তুলবে।

জাতিসংঘ এবং আন্ঃসরকার জরবায়ু পরিবর্তন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ৬৫০ জন বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষন এবং পরীক্ষা নীরিক্ষার প্রায় ত্রিশ হাজার তথ্য উপাত্ত ঘেটে যে মূল এবং প্রদান তথ্য বেরিয়ে এসেছে তা'হল এই যে জলবায়ু পরিবর্তন সমগ্র বিশ্ব ব্যাপী এমনভাবে সংঘটিত হতে শুরু করেছে যে প্রতিনিয়তই এর তীব্রতা বাড়ছে। বেড়ে চলছে তীব্রতার মাত্রা, সংখ্যা এবং স্থায়ীত্ব। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে শিল্পায়ন এবং শিল্পবিপ্লব জলবায়ু পরিবর্তনে অগ্রনী ভূমিকা রেখেছে এবং বর্তমানেও রাখছে।

'পথিবী বা প্রকৃতি শুধু ভোগের জন্য' এ মতবাদ প্রথম শিল্প বিপস্নবই মানুষকে দিতে শুরন্ন করে। এ প্রভাব থেকে পৃথিবীর উপর শুরন্ন হতে থাকেনানা ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ। জীবাশ্ম জ্বালানী চাড়া আধুনিক প্রগতির ধারক বাহক কলকারখানা, যানবাহন,বিদ্যুৎ উৎপাদন, ইটভাটা ইত্যাদি অচল হয়ে পড়ে। সারা বিশ্বব্যাপী মানুষের অতিভোগী জীবন ধারার কারনে এবং বেহিসাবীভাবে শিল্পায়ন ও

শহরায়নের ফলে বিশ্ব পরিবেশ আজ বিপন্ন। জীবন ব্যবস্থা, শিড়্গা এবং আচরনে পরিবেশকে অবহেলার কারনে সারা বিশ্ব আজ হুমকির মুখে। তড়িঘড়ি শিল্পায়ন কার্যক্রম বাস্বায়নের প্রতিযোগীতা জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারন। কলকারখানা, ট্রাক, লরি, বাস, জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদি প্রতিদিন নয়শত বিশ (৯২০) কোটি টন ধোঁয়া বায়ুমন্ডলের ঘনত্ব বাড়াচ্ছে। জনগণের অসচেতনতাও জলবায়ু পরিবর্তন ঘটাতে অবদান রাখছে। কলকারখানা, যানবাহন থেকে নির্গত ধূয়ায় রয়েছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নে ৩ ভাগের ২ভাগ অবদান রাখছে। আর ১ ভাগ অবদান বানিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত কৃষি কাজে যা মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস নিঃসরন ঘটাচ্ছে বায়ুমন্ডলে। বৃক্ষ নিধন এবং বন জঙ্গল উজাড় করে কলকারকানার কাঁচামাল সরবরাহের প্রক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস জমছে অব্যবহৃত ভাবে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রহন করে গাছপালা এবং এই গাছপালাই আবার নিঃসরন করে অক্সিজেন। সুতরাং প্রাকৃতিক ভাবে গ্রীন হাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রিত হয়ে স্বাভাবিক ভারসাম্য রক্ষা করতে গাছপালা বন জঙ্গল। অপরিহার্য মানুষ এই সব গাছপালা বন জঙ্গল উজাড় করে বৈশ্বিক উষ্ণায়নে কার্বনের ভূমিকা ৭০% বাড়িয়ে দিচ্ছে।

বৈশ্বিক জলবায়ুর ন্যয্যতা হলো বিগত দুই শতাব্দীতে যারা অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হয়েছে তাদেরকেই বৈশ্বিক কার্বন উদগীরন প্রশমনের জন্য দায়িত্ব নিতে হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তন সর্ম্পকিত যে কোন উদ্যোগ অবশ্যই অধিক ঝুঁকিপূর্নদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রদানে এবং সার্বিক অধিকার রক্ষায় গৃহিত হবে। স্থানীয় প্রেক্ষিতে জলবায়ু ন্যয্যতা হচ্ছে সামাজিক ভাবে বঞ্চিত অধিক ঝুঁকিপূর্ন দরিদ্র এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি সমূহ মোকাবেলায় স্থানীয় সরকারকে উদ্বুদ্ধ করতে তৃনমূল পর্যায়ের বিভিন্ন অংশীদারিত্ব মূলক আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম উদ্যোগ সমূহ যা ঝুঁকিপূর্নদের সার্বিক জলবায়ু নিরাপত্তা প্রদানে গৃহিত হবে। জলবায়ু ন্যয্যতার সংহতি দাবি করে যে শিল্পোন্নত দেশ সমূহ ঐতিহাসিক ভাবে এবং বর্তমানে বৈশ্বিক উষ্ণতার বৃদ্ধির জন্য অধিকাংশভাবে দায়ি এবং গ্রীন হাউস গ্যাস উদগীরণ চরমভাবে প্রমমনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে পারে। শিল্প (কোম্পানী) যদি আসলেই চায় ন্যায় ভিত্তিক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে তাহলে তাকে চলমান স্বচ্ছ মেয়াদী মুনাফার ধারা পরিত্যাগ করতে হবে।

জলবায়ু ন্যয্যতা দাবী করে যে জলবায়ু নীতি অবশ্যই আন্ঃ প্রজন্ম প্রেক্ষিতকে বিবেচনায় নিবে। জলবায়ু ন্যয্যতা দাবী করে যে ন্যায় ভিত্তিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে আমাদের ভবিষ্যৎ কে প্রভাবিত করে এমন পছন্দ সমূহ এখনি নির্ধারন করে ফেলা। আমাদের নিজেদের স্মরন করিয়ে দিতে হবে যে , জলবায়ুর বিপন্নতা রোধ কল্পে আমাদের কার্যক্রম এবং দায়- বদ্ধতাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অবশ্যই বিচার করবে।

২.২. জলবায়ু নিরাপত্তাহীনতা

জলবায়ু নিরাপত্তা প্রত্যক্ষ ভাবে মানুষের জীবনের সাথে জড়িত। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য বিরাট হুমকী স্বরূপ, বিশেষ করে যেগুলো ক্ষুর্ধা ও দারিদ্রতা এবং স্থায়িত্বশীল পরিবেশিক উন্নয়নের সাথে সর্ম্পকিত। জলবায়ু পরিবর্তন নিগৃহিত জনগোষ্টীর স্থায়িত্বশীল জীবিকার উৎস সাধারন প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অভিগম্যতা হ্রাস করে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যহত করতে পারে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ পরিবর্তনশীল জলবায়ুর সাথে খাপ খাইয়ে আসছে। বিশ্বব্যাপী স্থানীয় জলবায়ুর পরিবর্তন মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত অবস্থার পরিণতিগুলোকে প্রভাবিত করে । বৈশ্বিক উষ্ণতায় মেরু অঞ্চলের বরফ গলছে। পর্বত গুলোর শিখর এখন আর তুষারাবৃত নেই। নদ নদীর প্রবাহ হ্রাস পাচ্ছে। নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে। এসবের উপর নির্ভরশীল মানুষের, প্রকৃতির সন্তানদের, দুর্দশা ক্রমশ বেড়ে চলছে বৈশ্বিক উষ্ণতার সাথে প্রতিযোগিতা করে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনেক অনিশ্চয়তা আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হচ্ছে , ভয়াবহ প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারনে জনসাধারনের স্থানান্র বৃদ্ধি পাচ্ছে , খাবার জলের অভাব, তেমনি হচ্ছে চাষাবাদের জন্য সেচের জলের অভাব।

খাদ্য নিরাপত্তার উপর ব্যাপক প্রভাব পড়বে: আন্তর্জাতিক খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা (FAO) সাম্প্রতিক গবেষনায় দেখিয়েছেন যে , জলবায়ু পরিবর্তনের মূল্য দিতে গিয়ে উন্নয়নশীল দেশের ৬৫টি রাষ্ট্রের প্রায় ২৮০ মিলিয়ন টন দানাদার খাদ্যেও উৎপাদন হারকে যা মোট কৃষি উৎপাদনের ১৬%। ২০৮০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য উন্নয়ন বিশ্বে বৃষ্টি নির্ভর জমির পরিমান ১১% কমে যাবে।এই সময়ের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর অতিরিক্ত ৬০০ মিলিয়ন মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে পুষ্টিহীনতায় ভোগবে। এমনকি মৌসুমী বায়ু প্রভাবের সামান্য পরিবর্তন হেরফেরের কারনে দক্ষিন এশিয়ার খাদ্য নিরাপত্তার উপর ব্যাপক প্রভাব পড়বে।

২.৩. জলবায়ুর সাথে অভিযোজন/ জলবায়ুজনিত অভিযোজন

সামগ্রিক অর্থে অভিযোজন বলতে বিদ্যমান পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে প্রাণীকূলের টিকে থাকার বা মানিয়ে চলার বা খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়াকে বুঝায়। কিন্তু জলবায়ুজনিত অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানো বলতে বুঝবো ক্রমবর্ধমান জলবায়ুর প্রকৃতি পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মনুষ্যকূলের টিকে থাকার বা মানিয়ে চলার সহজাত প্রক্রিয়াকে, যা কি না জলবায়ু ঝুকিপূর্ণ কমিউনিটির নিজস্ব অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও সজ্ঞাকে ব্যবহার করে লাগসই প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারের নিশ্চয়তা। অভিযোজন হচ্ছে প্রকৃত বা সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে বর্তমান বাস্তবতার সমন্বয় সাধন। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নতুন প্রতিবেশিক, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়াকে জলবায়ুজনিত অভিযোজন বলা হয় । এই সমন্বয় প্রাকৃতিক নিয়মাবলী বা মানবীয় কর্ম পদ্ধতির মধ্যে হতে পারে কিংবা নতুন তৈরী হওয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সুফল বয়ে আনা যেতে পারে। মূলতঃ অভিযোজন বলতে জলবায়ুর পরিবর্তন সাপেড়্গা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে বর্তমান ও ভবিষ্যত মানুষের খাপ খাইয়ে নেয়ার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং খাপ খাইয়ে নেওয়ার উপযুক্ত পরিবেশকে বুঝায়।

২.৪. জলবায়ু ন্যয্যতা ও অভিযোজন প্রক্রিয়ায় নারীদের সমানধিকার

জলবায়ু পরিবর্তনে পুরুষের চেয়ে নারীরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বন উজাড়, জলের দুস্প্রাপ্যতা, ভূমির উর্বরতা হ্রাস এবং কৃষি ও শিল্প কলকারখানা ব্যবহৃত জৈব রসায়ণ জনিত দূষণ সংশ্যবে নারী এবং পুরুষ আসে ভিন্নভাবে। প্রকৃতি এবং পরিবেশ থেকে সম্পদ আহরণের পন্থা সমূহেও নারী পুরুষের ক্ষেত্রে রয়েছে ভিন্নতা। জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতির প্রশ্নে নারী পুরুষের ক্ষেত্রেও রয়েছে ভিন্নতা

বাংলাদেশে পুরুষের তুলনায় নারী, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপর্যয় গুলোর প্রভাবে, অধিকতর সংখ্যায় চরম ক্ষতির শিকার হবে। স্বাস্থ্যসম্মত বিশুদ্ধ পানীয় জলের পুস্প্রন্যতা, বিশেষ করে উপকুলীয় অঞ্চলগুলো এবং দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের খরাক্রন্ত এলাকা গুলোর অবস্থাদাঁড়াবে চরমে। এ হেন অবস্থায় নারী এবং শিশু, যারা সংসারে পানীয় জল সংগ্রহে সর্বক্ষন বেশী অবদান রাখে তারা অমানবিক অবস্থার সম্মুখীন হতে বাধ্য হবে। বাধ্যতা মূলক ভাবে ক্রমাগত লবনাক্ত জলপানে সৃস্টি হবে স্বাস্থ্য সংকট, বিশেষ করে গর্ববতী মায়েদের অবস্থা দাঁড়াবে বর্ননাতীত দুরবস্থায়। এখন পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন জনিত পৃথিবী ব্যাপী সৃষ্ট সংকটে যারা সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেই নারী এবং শিশুদের পক্ষ হয়ে নারীদের ভূমিকা বা নেতৃত্বে এগিয়ে আসা নারীদের সংখ্যা অতীব নগণ্য। অভিযোজন প্রশ্নেও নারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য ভাবেই অপ্রতুল এবং গোটা বিষয়ে অচিরেই নারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পৃথিবীতে ভিন্নতর চিত্র এবং পরিস্থিতি সৃষ্টিতে অনন্য সাধারণের অবদান রাখা অত্যান্ত জরুরী।

বাংলাদেশে নারীর সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার প্রায় অর্ধেক (৪৮.৯%=২০০৪ বিশ্ব ব্যাংকের তথ্যানুযায়ি) এদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন নারী বাস করে গ্রামাঞ্চলে । নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশ্নে স্থানীয় জাতীয় পর্যায়ে তাদের ক্ষমতায়নে অগ্রধিকার পেতে শুধু মাত্র এই একটা কারণই যথেষ্ঠ। এজন্য সর্বস্তরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বা যত্নবান হতে, অবহেলা,কার্পন্য বা অন্যকোন ধরণের অজুহাতের

কোন অবকাশ নেই। বর্তমানে বিরাজমান নারী পুরুষের বৈষম্য, জলবায়ু পরিবর্তনের সৃষ্ট সমস্যাদির কারনে প্রকট থাকার কারনে প্রকট থাকার ধারন করতে পারে এবং এই বৈষ্যমের ব্যাপারটাকে আরও সাধিকতা মাত্রায় খারাপ অবস্থার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনে উদ্ভুত সমস্যাবলী মোকাবিলায়, অবধারিত আর্থ -সামাজিক পরিবর্তনে, অভিযোজন ও উপশমের সমস্যা সমাধানে, নতুন সমাজে, নতুন জীবন ধারা প্রবর্তন, অপরিহার্য ভাবেই প্রয়োজন জলবায়ু ন্যয্যতা ও অভিযোজন প্রক্রিয়ায় নারীদের সমানধিকার।

২.৫. অস্তিত্বের সংকটে বর্তমান ও ভবিষ্যত এবং অভিযোজনের প্রয়োজনীয়তা

অভিযোজন একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে মানবকুলের আবির্ভাব থেকেই বিদ্যমান পরিবেশের সাথে অভিযোজন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে নিজেদেরকে আদিম সমাজ থেকে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার সহযাত্রী হিসেবে আবিস্কার করেছেন। যেমন- গাছের ছালের পোষাক থেকে এখন আধুনিক সাজ-পোষাক, পাথরে পাথরে ঘর্ষন লাগিয়ে আগুন জ্বালানোর পরিবর্তে এখন দিয়াশলাইয়ের ব্যবহার, গুহায় বসবাসের পরিবর্তে এখন আধুনিক ঘর-বাড়িতে বসবাস ইত্যাদি কর্মকান্ডের সবকিছুই ছিল পরিবেশ, প্রতিবেশ ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের টিকে থাকার সময়োপযোগী অভিযোজন প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত্ব। সেই চিরন্ত্বন অভিযোজন প্রক্রিয়ায় নেয় বর্তমানেও মানুষকে টিকে থাকতে হচ্ছে। তবে বর্তমান অভিযোজনের সাথে অতীতের অভিযোজনের মধ্যে রয়েছে বিস্ত্বর ফারাক। অতীতে মানুষ নিজেদের বংশ পরাম্পরা এবং শাসন ক্ষমতা ধরে রাখতে গোত্রে-গোত্রে জাতিতে-জাতিতে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল মাতৃস্নেহতুল্য ও নিয়মতান্ত্রিক, বর্তমানে চলছে বিশ্বব্যাপী ধনিকশ্রেণী কর্তৃক গরীবশ্রেণী গ্রাসের লড়াই যেখানে পরিবেশিক আচরণ অত্যন্ত্ব বৈরী। যা মানুষের জীবন-জীবীকার অস্থিত্বকে সংকটময় করে তুলছে।

শিল্প কল-কারখানার ব্যবহারের জন্য প্রকৃতির প্রাণ গাছপালা-বনজঙ্গল কেটে উজাড় করে দেওয়া ও উন্নত রাষ্ট্রসমূহের উদগীরীত কার্বনে ধাই ধাই করে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে হিমালয়ের বরফ গলে যাচ্ছে, সমুদ্র পৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, নদী-নালা-খাল-বিল ভরাট হয়ে যাচ্ছে, অতি বৃষ্টি, অনা বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, শৈত্য প্রবাহ, খরা, নদী ভাঙন, মরন্নময়তা, লবনাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে সুপেয় পানির সংকট তৈরী হচ্ছে, বসতি স্থানান্ত্বর, কৃষির অবনতি, জলাবদ্ধতা ও আইলা-সিডরের মত বড় বড় প্রাকৃতিক দূর্যোগ ক্রমবর্ধমানহারে বেড়ে চলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের দিক থেকে আমরা পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী। এমতাবস্থায় আমরা উলিস্নখিত সমস্যাগুলোর কোন সমাধান করতে পারবো না, তবে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা ও লোকায়ত জ্ঞানের ব্যবহার করে বিদ্যমান পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করে আমাদের জীবন-জীবীকা ও অস্তিত্বকে রক্ষা করে টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন অভিযোজন । কারণ একমাত্র অভিযোজন কৌশলই কেবল চলমান প্রক্রিয়ার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে সহায়তা করে।

অনেকেই হয়ত জানিনা বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত কয়রার কয়েক লক্ষ্য লোক দুর্যোগও লোনা জলের প্রবেশে ঘর বাড়ি জমিজমা হারিয়ে উদ্বাস্তে পরিণত হয়েছে। উপর্যোপরি নদী ভাঙ্গনে আরও অগনিত মানুষ চিরতরে হারিয়েছে এবং হারাচ্ছে তাদের পৈত্রিক ভিটে মাটি। বাংলাদেশের মত ক্ষুদ্র এবং ঘনবসতিপূর্ণ একটা দেশে জমিজমা হারিয়ে লাখ লাখ লোক উদ্বাস্তে পরিণত হলে কোন সরকারেরই সেই সমস্যা সমাধানের সাধ্য নেই। মিডিয়া মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছে বিপর্যয়ের খবর আর ছবি। কিন্তু এতে মানুষের হৃদয়ে কোন ব্যাতিক্রমী উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কাজ করে না, যতটা গুরুত্বের তীব্রতা নিয়ে কাজ করা দরকার। তারা শঙ্কিত হয়না। আতঙ্কিত হয়না। যেন গা সওয়া হয়ে গেছে, এমনই একটা ভাব।

২.৬. জলবায়ুজনিত অভিযোজন বা খাপখাওয়ানোর জন্য কর্মকৌশল

ক) বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রুপ গঠনঃ আমরা গ্রামভিত্তিক, ইউনিয়ন ভিত্তিক, উপজেলা ভিত্তিক এবং জেলা ভিত্তিক নারী- পুরন্নষের সমন্বয়ে আলাদা আলাদা গ্রন্নপ গঠন করতে পারি। প্রত্যেক গ্রন্নপের সাথে জলবায়ুর পরিবর্তন ও অভিযোজন সম্পর্কিত মানানসই বিভিন্ন

বিষয়ের উপর সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারি। বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেক হোল্ডার ও কমিউনিটিকে এ কাজগুলোর সাথে স্বতস্ফূর্তার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, এতে জলবায়ু ঝুকি প্রশমন কর্মকান্ডে তাদের খাপ খাওয়ানোর কৌশলগত সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

খ) বিদ্যামান সমস্যাগুলোর মধ্যে থেকে প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো নির্ণয় করাঃ কমিউনিটিকর্তৃক বিদ্যমান জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কিত (অতি বৃষ্টি, অনা বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, শৈত্য প্রবাহ, খরা, নদী ভাঙন, মরন্নময়তা, লবনাক্ততা বৃদ্ধি, সুপেয় পানির সংকট, বসতি স্থানান্তর, কৃষির অবনতি, দারিদ্র, জলাবদ্ধতা ইত্যাদির) সমস্যাগুলোর মধ্য থেকে অধিক গুরন্নত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো খুজে বের করতে অংশগ্রহনমূলক গবেষণা এবং সামাজিক মানচিত্র তৈরী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যাগুলোর মধ্যে থেকে প্রধান প্রধান কয়েকটি সমস্যাকে চিহ্নিত করতে পারি, যে সমস্যাগুলো কমিউনিটির নিজস্ব অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও সজ্ঞাকে ব্যবহার করে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন করে মোকাবেলা করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে কমিউনিটির শতভাগ অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

গ) কমিউনিটির তৈরী অভিযোজন প্রস্পবনাঃ উলিস্নখিত প্রক্রিয়ায় বাছাইকৃত প্রধান প্রধান সমস্যাগুলোর সঙ্গে অভিযোজন করার জন্য কমিউনিটির অংশগহণে গ্রামভিত্তিক, ইউনিয়ন ভিত্তিক, উপজেলা ভিত্তিক এবং জেলা ভিত্তিক একটি করে অভিযোজন প্রস্ত্মাবনা তৈরী করা যেতে পারে। সেগুলোর আলোকে পরবর্তীতে একটি জাতীয় পর্যায়ের জলবায়ু অভিযোজন প্রস্ত্মাবনা তৈরী করতে হবে।

ঘ) কমিউনিটির অভিযোজন প্রস্পবনাকে মাঠ পর্যায়ে বাস্বায়নঃ কমিউনিটির তৈরী অভিযোজন প্রস্ত্মাবনাকে মাঠ পর্যায়ে বাস্ত্মবায়ন করতে সিডিপি বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী ও সরকারসমূহের সাথে অধিপরামর্শ দরকার। বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী তাদের লোকায়ত জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করে বিদ্যমান পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে অভিযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে টিকে থাকতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কমিউনিটির অংশগ্রহণই অভিযোজন প্রক্রিয়ায় সফলতার মূলমন্ত্রস এবং তাদেরকে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে সকল প্রকার করনীয় নির্ধারণ করতে হবে। কারণ সমগ্র প্রক্রিয়াটি কমিউনিটির নিজস্ব অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও সজ্ঞাকে ব্যবহার করে বাস্ত্মবায়ন করা হবে।

২.৭. দলগত প্রয়াসে জলবায়ুর সাথে অভিযোজন

'দূর্যোগ' শব্দটির সাথে 'দূর্ভোগ' শব্দটির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট। প্রাকৃতিকই হোক আর কৃত্রিমই হোক যে কোন প্রকার দূর্যোগের দূর্ভোক মোবালো করা একার পক্ষে কোন ভাবেই সম্ভব নয়। কারণ দূর্যোগ কখনো একার জন্য আসেনা, আর একার জন্য আসলেও তার মাসুল অন্যদেরকেও দিতে হয়। কথায় আছে-'পাপে মরে সাত ঘর নিয়ে'। যেমন- পরিবারের মূল রোজগারকারীর কোন প্রকার সমস্যার কারণে পরিবারের সকল সদস্যদেরকে তার দূর্ভোগ পোহাতে হয়। এখানে দূর্যোগ বলতে জলবায়ুর প্রকৃতি পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট সমস্যাকে বোঝানো হয়েছে, যার নেতিবাচক প্রভাব সমগ্র পৃথিবীর দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর উপর অতি মাত্রায় পড়ছে। যেখানে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে দূর্যোগকবলিত, যা একক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মোবাবেলা করা সম্ভব নয়।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দূর্যোগ ধ্বনি রাষ্ট্রসমূহের কু-প্রবৃত্তি এবং প্রাকৃতির অমোঘ নিয়মে চলতেই থাকবে। তারমধ্যে দিয়ে আমাদের অভিযোজন করে টিকে থাকতে হবে এবং ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য আবাস্থল রেখে যেতে হবে । যার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন পর্যায়ের কমিউনিটিকে নানাবিধ সচেতনতা ও দক্ষাবৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সংগঠিতকরণ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের সম্মিলিত সামাজিক কর্মকান্ড, সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে দূর্যোগ মোকাবেলায় গ্রামভিত্তিক, ইউনিয়ন ভিত্তিক, উপজেলা ভিত্তিক, জেলা ভিত্তিক তথা জাতীয় পর্যায়ের একটি কমন পস্নাটফর্ম গঠন করা ও উন্নত রাষ্ট্রসমূহের সাথে/দাতা গোষ্ঠীর সাথে/জাতিসংঘের বিভিন্ন বডির সাথে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে অধিপরামর্শ। তবে সর্বক্ষেত্রে ঝুকিপূর্ণ কমিউনিটিকেই আগে এগিয়ে আসতে হবে, কারণ তাদের সমস্যা তারাই ভালভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন। এজন্য তাদের সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনটাও বেশি।

বাংলাদেশের মানুষকে প্রকৃতির সাথে বসবাস করতে হয়। তাই প্রকৃতির উর্বরা শক্তি ও অবদানমুখী কার্যকরনের উপর মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ভর করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে মানুষ বহুবিদ সংকটে পড়বে এবং মানুষের জীবনধারন করা এত কঠিন হবে যে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ছাড়া পথ থাকবে না। সমুদ্রের পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারনে নদী খাল-বিল ও জলাশয়ের পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। অনেক বাড়িঘর পানির নিচে চলে যাবে। কম স্থানে বেশী লোক থাকার ফলে জনসংখ্যার ঘনত্ব অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। খাদ্য নিরাপত্তা থাকবে না,স্বাস্থ্যহানী ঘটবে এবং দারিদ্রের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে।

অধ্যায় ৩

মানুষের অমানবিক নির্যাতনে অসুস্থ পৃথিবী





‘পৃথিবীর মানুষ বিলুপ্তির পথে’। এই শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই “মানব কূল পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে”।

- অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক ফেনার

৩. একবিংশ শতাব্দীই হচ্ছে মানব কুলের জন্য শেষ শতাব্দী

ন্যায়-নীতি-বিবর্জিত মানুষের লোভের সংক্রমনে গোট বিশ্ব জর্জরিত, পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিষাক্ত ছোবলের বিষক্রিয়ায় পর্যুদস্ প্রানীকুল, গোট বিশ্ব ধুকছে এখন জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সংকট মোকাবিলায়। চরম সংকটাপন্ন হওয়ার হুমকির সম্মুখীন অঞ্চলগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ প্রথম সারিতে। অথচ পরিহাসের বিষয় হচ্ছে এই যে, এই পরিনতির জন্য পৃথিবীর মনুষ্য সম্প্রদায়ে সংখ্যাগুরু যারা- তারা মোটেই দায়ী নয়। এ বিষয়টা আমাদের বুঝতে হচ্ছে, অনুধাবন করতে হচ্ছে, উপলব্ধি করতে হচ্ছে মনোদৈহিক অনুভূতি সহকারে। 'পৃথিবীর মানুষ বিলুপ্তির পথে'। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক ফেনার এমনই ভবিষ্যৎ বানী দিয়েছেন যে এই শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই "মানব কূল পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে"। প্রতিদিন সংবাদ মাধ্যমগুলো গোটা বিশ্বের বিপর্যয়গুলোর যে চিত্র তুলে ধরেছে আমাদের চোখের সামনে তা অমূলক নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে আবহাওয়াবিদদের দেওয়া পূর্বাভাসগুলো বাস্তবভাবেই দেখা যাচ্ছে। অঘটন ঘটছে এবং ঘটতে থাকবে। প্রফেসর ফ্রাঙ্কফেনারের ভবিষৎ বানী অনুসারে এই বর্তমান এশবিংশ শতাব্দীই যদি মানব তথা প্রানী কুলের জন্য শেষ বলে ধরা হয় সেক্ষেত্রে ধুঁকে ধুকে মরার চেয়ে একবারেই শেষ হওয়া অনেক উত্তম, এ বিষয়ে একটা ছোট রসাত্নক গল্প সরণ হল।

গল্পটা এ রকমঃ

এক গ্রামে বিপত্নীক এক লোক সোমত্ত চারজন ছেলে সন্তান রেখে মারাগেল। ছেলেরা সবাই ধর্মে কর্মে বিশ্বাসী সহজ সরল। খেয়েপড়ে মোটামুটি দিন চলে যায় তাদের। এক ঝড়বাদলের দিনে বাতাসের প্রবল ঝাপটায় তাদের পুরানো বসত ঘরখানা গোঙাতে শুরু করলো। ছেলেরা দেখলো তাড়াতাড়ি ঠেকা না দিলে মহা বিপর্যয় হবে। চার ভাই ঘর বাঁচানোর তাগিদে বাঁশ জোগাড় করে ঠেকনা দিতে শুরু করলো ঘরের কোনে। কিন্তু ঝড়ের বেগ উত্তরোত্তর প্রবল হলে বড়ভাই অন্য ভাইদের ডেকে বললো দেখ, ঠেকনা দিতে ঠেলাঠেলি করে ঘরের সাথে পাল্লা দিয়ে আমরা সবাই এখন ক্লান্ত। ছোট ভাইরা সায় দিল বা মিয়া ভাই যা বলেছেন তাই ঠিক। বড় ভাই তখন বললো দেখ আল্লহত্ম সাথে পাল্লা দিয়ে কোন লাভ নেই। ঝড় দিছে আল্লায়, আমরা এতক্ষণ আল্লাহর কাজের বি রোধিতা করেছি। এটা সত্যিই খারাপ, সুতরাং আল্লাহ যেটা চাচ্ছেন সেটা করাই উত্তম কি বলিস। সব ভাই সমস্বরে হ্যাঁ বললো । তখন বড়ভাই আবার বললো তাহলে এক কাজ কর, সবাই মিলে যে দিকে থেকে ঝড় আসছে আমাদের ও উচিৎ হবে ঘর টাকে সেদিক থেকে ঠেলে ঝড়ের সাথে আল্লাহর ইচ্ছা পূরণ করা । বিশ্বাসী সব ভাই বড়ভাইয়ের কথা অমান্য করতে পারে? সবাই মিলে ঝড়েকে যখন সহায়তা করলো তাদের বেশী পরিশ্রম ও করতে হলনা। ঘরটা পড়ে গেল, সবাই সন্তুষ্ট চিত্তে ভিজছে। ভেজা শরীরে একটু ঠান্ডা অনুভব হতে বড়ভাই বললো এই যে ছোট এখন একটু হুকোটা নিয়ে আয় তো তামাক ভরে। একটু জিরিয়ে নিই, কি বলিস। হ্যাঁ মিয়া ভাই, এখন তামাক খাওয়ার ফুরসুৎ তো হল। এতক্ষন যা ধকল গেছে। জিরোবার দরকার।

যেহেতু একবিংশ শতাব্দীই হচ্ছে মানব কুলের জন্য শেষ শতাব্দী এবং যেহেতু ধনীবিশ্বের মহাজনবৃন্দ তাদের কলকারখানা কার্বন নি:সরন বন্ধ করবেন না সেহেতু আমরা এই তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠি অত্যাধিক পরিমানে কার্বণ নি:সরনে তাদের সমকক্ষতা অর্জন প্রয়াসে পৃথিবীর যাবতীয় কয়লা খনি, প্রাপ্ত জীবাশ্ন এখনও জীবিত বনজঙ্গল এবং দাহ্যবস্তুতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বায়ুমন্ডলে ভাসমান কার্বন পরিমান বাড়াতে সচেষ্ট হব। আমাদের সামনে, এ ছাড়া , তাড়াতাড়ি ঐ সব মহাজনদের সমকক্ষ হবার বিকল্প কোন পথ খোলা নেই। আমাজন রেইন করেষ্ট থেকে শুরু করে, কয়লা খনিগুলো এফোড় ওফোড় করে, যাতে প্রশজ্জ্বলিত হতে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যাহত না হয় সেই বন্দোবস্ত করে, পৃথিবীর যাবতীয় বন যেমন বাংলাদেশে সুন্দরবন সহ অন্যান্য গরীব দেশের বনন্যলোয় আগুন ধরিয়ে দিলে কার্বন নি:সরণ ঘটবে অত্যন্ত দ্রুত হারে। আমাদের তথাকথিত সুসভ্য (!) উত্তর গোলার্ধের বড় ভাইদের কাজের বিরোধিতা না করে তাদের মতানুসারেই চলা প্রয়োজন, যেহেতু তাদের আনুকুল্যে বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ আমাদের দান খয়রাত করছে। যেহেতু এই সব সংস্থা সংগঠণগুলোও ইতিমধ্যেই বড়ভাইদের পকেটসহ তখন আমাদের কারো পক্ষেই উচিত হবেনা বড়ভাইদের কাজের বিরোধিতা করা। বায়ুমন্ডলের কার্বন আধিক্য হেতু গরমের আঁচটা আমাদের গায়ে বেশী লাগলেও আমাদের প্রতিবিধান করার কিছু নেই যখন, তখন তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে আমরাও অত্যাধিকমাত্রায় কার্বন- নিঃসরণ ঘটানোর রাস্তা ধরবো বিষয়টার বৈপরীত্য প্রনিধানযোগ্য।

৩.১. পুঁজিবাদের কার্বন ছোবলের বিষক্রিয়ায় অসুস্থ পৃথিবী

শিল্প বিপ্লবমানুষের জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় থেকেই শিল্প বিপ্লবের দৌড় প্রতিযোগিতা মানুষের জীবন ধারায় যে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে তা অকল্পনীয়। এ সব পরিবর্তনের মাঝে সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব যেটা মানব সমাজে প্রতিফলিত হয়েছে তা হল সাংসারিক জীবন যাত্রায় মানুষের একান্নবর্তী পরিবারে বন্ধন ছিন্ন করা। পুঁজিবাদ বিকশিত হতে হলে এই একান্ন পরিবারের ধ্বংস স্তুপের উপর পুঁজিবাদের ভিত গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল। আর তখন থেকেই মানুষের মানবিক মূল্য বোধের অবক্ষয় প্রক্রিয়াও জোরালো ভাবেই শুরু হয়েছিল।

উত্তর গোলার্ধের ট্রান্স ন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলো এবং অন্যান্য কর্পোরেট ব্যাবসায়ী জোটের ঐক্যবদ্ধ অমানবিক নির্যাতনে দূষনে ভূগছে পৃথিবীর আবহাওয়া মন্ডল। শিল্পোন্নত দেশগুলোর কলকারখানা নিঃসৃত কার্বণডাই অক্সাইড গ্যাস পৃথিবীর বায়ুমন্ডলকে প্রতিনিয়ত দূষিত করে চলছে। এই দূষনের মাত্রা ২০০৯ তে ৩৪০ পিপিএম এর নিচে ছিল। ২০১০ এর শুরুর দিকেই তার তাপমাত্রা পাওয়া যাচ্ছে ৪৩০ পিপিএম। এর থেকেই বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণটা সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। এই পিপিএম বাড়বে ছাড়া কমবে না। কারণ শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের কলকারখানা বন্ধ করবেনা। পৃথিবীর মহাজনদের প্রধান লক্ষ্য কার্বন নি:সরণ যাতে বন্ধ না হয়। যে জন্য তারা ১৯ বছর আগে ওয়াশিংটন বৈঠক থেকে শুরু করে কোপেন হেগেন জলবায়ু পরিবর্তন আন্দোলন বানচাল করতে কোন কসুর করেন নি। ওয়াশিংটন, বালী, কিয়োটো, কোপেনহেগেন- কোথাও বৈঠক ফলপ্রসু হতে পারেনি। ইত্যবসরে প্রাকৃতিক সম্পদ লুন্ঠন এবং বন উজাড় প্রক্রিয়াও থেমে থাকেনি। নিঃসৃত কার্বণ মাত্রা কিছুটা হলেও কমে যেত যদি পাইকারী হারে বন উজাড় না হত।

পৃথিবীর বিখ্যাত আমাজন ফরেস্ট থেকে শুরু করে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার গাছপালা পাইকারী হারে হত্যা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। (গাছের ও প্রাণ আছে)। সুতরাং মানুষ নিজেরা যে নিজেদের ধ্বংস টেনে আনছে তাতে এখন আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। মানুষ সহজাত বৈশিষ্টগুলো হারিয়ে ভিন্নতর অস্তিত্বে রুপান্র ঘটিয়েছে। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর মানব সম্প্রদায় নিজেদের কার্যকলাপে, নিজেদের ধ্বংস, নিজেরাই টেনে এনেছে কয়েক শতাব্দী ধরে। বিজ্ঞানী নিউটনের প্রদত্ত সুত্র অনুযায়ী "প্রতিটি কর্মেরই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে"- শুধু বিজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এই সূত্রের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ডে।

পৃথিবীর সংখ্যাগুরু দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যান কামনা না করে সেখানে তাদেরকে ক্রেতা, ভোক্তা এবং চির দরিদ্র রাখার নীতি বজায় রাখার স্বার্থেই পুঁজিবাদী অর্থনীতির এত তোড়জোর। ফলশ্রুতি হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের জন্ম। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো পুঁজিবাদী বিশ্বকে বাঁচিয়ে রাখছে এবং বাঁচতে সাহায্য করছে। তৃতীয় বিশ্বের অস্তিত্বছাড়া পুঁজিবাদী বিশ্বের অস্তিত্ব টিকেনা।এসব কথা অস্বীকার করার ক্ষমতা কোন টিএনসি বা কর্পোরেট ব্যাবসায়ী সংস্থার নেই। পুঁজিবাদী বিশ্বের এরাই হচ্ছেন ধারক বাহক। এদের কলকারখানা প্রসূত অস্ত্র, শস্ত্র তৃতীয় বিশ্বের রনাঙ্গনে ব্যাবহৃত হচ্ছে। যুদ্ধ জিঁইয়ে রেখে তৃতীয় বিশ্ব চালু রাখছে ধনীদের অস্ত্র তৈরী কলকারখানা সহ অন্যান্য কারখানা গুলো, যেগুলোর উৎপাদিত দ্রব্যাদির বাজারও তৃতীয় বিশ্ব। সুতরাং তৃতীয় বিশ্বের ভোক্তা ক্রেতারা ছাড়া যখন ধনী বিশ্ব অচল তখন ধনী বিশ্বকে সচল রাখতে আমরা আরও সহায়তা দেব বলে ভাবছি। আমরা ভাবছি ধনী বিশ্বের মহান মহাজনদের অনুসরন করলেই আমাদের মোক্ষলাভ ঘটবে। শাস্ত্রেই আছে;" মহাজনো যেন গতসঃ পন্থা"। মহাজনেরা যে পথ অনুসরন করেই মহাজন হয়েছেন, সেই পথ অনুসরন করেই আমরাও, এই তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোর দরিদ্র প্রান্সিক এবং ক্রেতা ও ভোক্তা জনগোষ্ঠী মহাজন হতে পারবো। পুজিঁবাদের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত লোকগুলো অবয়বে মানুষের আকারে হলেও তারা মনুষ্য পদবাচ্য নয়। তারা লোভী, স্বার্থপর এবং পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এক ধরনের জীব, যারা স্বার্থের জন্য, মুনাফার জন্য তাদের মায়ের বুকেও ছোরা বসিয়ে দিতে কুন্ঠা বোধ করবে না। এবং ঘটনা তাই ঘটেছে। পৃথিবী নামক দ্বিতীয় মায়ের বুকের ধন সম্পদ খুঁড়ে নিয়ে, বন সহ অন্যান্য সম্পদ লুটে নিয়ে, সম্পদের ভাগীদারদের বঞ্চিত করে, মুনাফা লুটের মহাযজ্ঞে পৃথিবীকে বলি দিয়ে, চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

৩.২. মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কার্বণ বিপ্লব এবং অমানবিক মানুষের অভ্যুদয়

মানুষের ক্রিয়াকান্ড জলবায়ু পরিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা রাখছে। যদিও জলবায়ু পরিবর্তন প্রাকৃতিক ব্যতিক্রমী তারতম্যে সংঘটিত হয় তবু বিজ্ঞানসম্যত প্রমানাদি রয়েছে যা গ্রনি হাউস গ্যাস সৃষ্টিতে মানুষের গুরত্বপূর্ন অবদান গুলোকেই তুলে ধরে। কার্বন-ডাই-অক্রাইড,মিতেন,নাইট্রাস অক্রাইড প্রভৃতি গ্রীন হাউস গ্যাস যা জলবায়ু পরিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা রাখছে এবং এজন্য মানুষই প্রধানত দায়ী। জীবাশ্ম জ্বালানী আহরণ এবং ব্যবহার, বানিজ্যিক ভাবে কৃষিতে ভূমির ব্যবহার যার জন্য ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধিই দায়ী করা হচ্ছে, প্রধানত এই কারণ গুলো জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী। ১৮৫০ নাগাদ শুরু হওয়া দ্রুত বিকাশমান শিল্প বিপ্লব বায়ুমন্ডলে ৩০% কার্বন মাত্রা বাড়িয়েছে, ১৫০% এর বেশী বেড়েছে মিথেন,নাইট্রাস অক্রাইড বেড়েছে ১৭% এবং ওজন বেড়েছে ৩৫%। ভূপৃষ্টের গড়পড়তা তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৩০ থেকে ০.৬০সেলসিয়াস। এ হিসাব শুরু হয়েছে উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে।

বিশ্ব বিখ্যাত জ্যোতি পদার্থ বিজ্ঞানী ষ্টিফেন হকিনস বলেছেন, " মানব জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে এই পৃথিবীর বাইরে কোথাও উপনিবেশ স্থাপন করতে হবে। এই পৃথিবীটা মানব জাতির অস্তিত্বের জন্য দিনদিন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে বলে তিনি মনে করছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই অবস্থার জন্য যারা দায়ী তারা কেন নিশ্চুপ? হকিনস বলেছেন, "উপনিবেশ" স্থাপন করতে কারণ পৃথিবীতে যে আগুন লাগানো হয়েছে তাতে যে গোটা পৃথিবীর প্রাণীকূলসহ পৃথিবী অন্তত্মতঃ পক্ষে কয়েক শ' বা হাজার বছর ধরে জ্বলতে থাকবে। পৃথিবী হয়তো কক্ষচুত্য হবেনা, কিন্তু, আবার প্রাণ ধারণ ক্ষমতা ফিরে পেতে কয়েক লক্ষ বছরের প্রয়োজন হবে।

তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র এবং প্রান্তিক্ষ লোকগুলোকে টিএনসি এবং অন্যান্য রাঘব বোয়াল কর্পোরেট ব্যবসায়ীরা বোঝা বলে মনে করে আসছে বহুদিন আগে থেকেই। তাদের পুজিঁ বৃদ্ধির চরম ঘৃন্যতম আকাঙ্খা, জঘন্যতম নীচ মনোবৃত্তি এবং অত্যন্ত্ম অশস্নীলভাবের জঘন্যতম স্বার্থপরতা পৃথিবী নামক গ্রহটার বর্তমান দৈন্যদশা, ধ্বংস হবার প্রক্রিয়ায় জ্বলে উঠার জন্য দায়ী। সাথে মানবকুলসহ অন্যান্য প্রাণী বিলুপ্ত হবার প্রহর, ক্ষণ, লগ্ন, গুনতে বাধ্য হচ্ছে। এই অবস্থার জন্য আমরা মোটেই দায়ী নই। জলবায়ুর এই সংকট সৃষ্টিতে, বায়ুমন্ডল দূষিত করতে, পৃথিবীর প্রাণী কুল বিলুপ্তির পথে নিয়ে যেতে, তৃতীয় বিশ্বের জনসাধারন, দরিদ্র এবং প্রান্তিক্ষ মানুষগুলো, মোটেই দায়ী নয়। আমাদের কারখানা নেই কার্বণ নির্গত করার, আমাদের গাড়ি নেই নির্গত গ্যাসে মানুষের আয় কমানোর। আমাদের এমন কোন প্রয়োজন পড়ে না বন জঙ্গল উজাড় করার। আমাদের প্রয়োজন নেই বন জঙ্গল ধ্বংস করে ব্যবসা ভিত্তিক কৃষি জমি বাড়ানোয়। সবচেয়ে ঐতিহাসিক দুঃখজনক ঘটনা হল, জাতিসংঘের কাঠামোগত ভাবেই করা চুক্তি অনুযায়ী এবং নীতিগত ভাবে স্বীকার করে নেবার পরেও, শিল্পোন্নত দেশগুলো গ্রীণ হাউস গ্যাস সৃষ্টি বন্ধ করতে কোন রকম ভূমিকাই রাখেনি। তারা স্বীকার করেছিল তারা জাতিসংঘের রীতি, নীতি, সনদ, সম্মান করবে, মানবে। কিন্তু তা তারা করেনি বিগত ১৬ বছরেও। বরং প্রতিটি বৈঠকে, বিভিন্ন রকম কুটচালে আর ফন্দি ফিকিরে করছে বানচাল করার।

সরকার তো চালাচ্ছে মানুষেই। মানুষেরও সীমাবদ্ধতা আছে। সুতরাং পার্থিব ভাবে বিপর্যয়ের দৈন্যদশা মোকাবিলা করা কতটা দুঃসাধ্য হবে তা ভালভাবেই অনুমান করা চলে। অথচ শতকরা ৯৯.৯৯ জন লোকই বর্তমান আজকের দিনটা দেখে আগামী কাল এমনই যাবে বলে মনে করে। আস্তেত্মধীরে ক্রমশ তাপ যে একটু একটু করে বেড়ে চলছে সে সম্পর্কে কোন ধারনাই করতে পারে না। তার কারণ জলবায়ু পরিবর্তন কেউ চাক্ষুস করছে না। অনুভব করে। বিগত শতাব্দীতে বায়ুমন্ডলের কার্বনের ঘনত্ব রয়েছে প্রাক শিল্পায়ন যুগের, যেখানে ২৮৭ পিপিএম, সেখানে ২০০৫ সালে তা হয়েছে ৩৭৯ পিপিএম এবং গড়ে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে দশমিক ৭৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। বিজ্ঞানীদের মতে এটাই হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে উষ্ণতা বৃদ্ধির ঘটনা। বিগত ২৫ বছরে উষ্ণতা বৃদ্ধির ঘটনা ঘটেছে তীব্রভাবে এবং সর্বশেষ ১২ বছরের মধ্যে ১১ বছরই সবচেয়ে বেশী তাপমাত্রা রেকর্ড স্থাপন করেছে। আইপিসিসির প্রতিবেদনে ২১ শতকের জন্য পূর্নাঙ্গ অভিক্ষেপন দিয়েছে এবং এতে দেখা যাচ্ছে যে বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়তেই থাকবে। এই শতকের মধ্যে উষ্ণতা বেড়ে যাবে ৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস। শুধু তাই নয়, কার্বণ নিঃসরনকারী দেশগুলো যদি তাদের সব কলকারখানা বন্ধও করে দেয় তা হলেও বেশ্বিক উষ্ণতা গড়ে ১.৮০ থেকে ৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস বাড়বে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

পুঁজিবাদ সর্ম্পকে সচেতন ও মানবিক মানুষ কিছুটা এলার্জিক। কারন পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তি হলো একক ব্যক্তি। এই ব্যক্তির মানবিক গুনাবলী আছে কি নেই সেই প্রশ্ন পুঁজিবাদে অবান্র। পুঁজিবাদ দেখছে তার অর্থাপাজন এবং তার কুক্ষিগত সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধিতে কতটা সক্ষমতা রয়েছে। যে কোন উপায়েই হোক না কেন, অর্থসম্পদ কুক্ষিগত করার প্রক্রিয়ায় সে কতটা পটু বা দক্ষ। এখানে অবশ্য মানুষ হিসেবে তার কোন প্রাধান্যই নেই। মানবিক গুনাবলী থাকা না থাকা নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলবেনা পুঁজিবাদ বা পুঁজিবাদের ধারক, বাহক বা প্রবক্তরা। তাই অর্থসম্পদ পুঁজিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে গোটা বিশ্ববাসীকে অধীনস্ রেখে মুনাফালুটের নীল নকশাই হলো বিশ্বায়ন ব্যবস্থার মূল কথা। আর এ কারণেই জঘণ্যভাবে বিশ্বব্যাংক, অর্থনীতির মুদ্রা তহবিল সহ গোটা বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল সরকারগুলো পুঁজিবাদের কাছে জিম্মি।

৩.৩. প্রয়োজন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অভিযোজন

বিশ্বযুদ্ধগুলো গোটা পৃথিবী ব্যাপী যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম, অস্ত্র গোলা বারন্নদ সরবরাহের প্রশ্নে অনেক কলকারখানার জন্ম দিয়েছে। এই কারখানাগুলোতে কাঁচামাল সরবরাহের প্রশ্নে পৃথিবীর যাবতীয় খনিজ এবং বণজঙ্গলের বড় বড় গাছ কেটে কাঠ সংগ্রহ করা শুরন্ন হয়েছে। এ প্রক্রিয়া থেকে আর ও ছোট কারাখানগুলোর জন্ম হয়েছে। এই কারখানাগুলোর চিমনী থেকে যে ধূঁয়াটা বে'র হচ্ছে তাতে রয়েছে কার্বন ডাই অক্রাইড এবং অন্যান্য গ্যাস। কারখানাগুলো ছাড়াও বোমা বর্ষনে, ঘরবাড়ি জ্বলে গিয়ে ধূঁয়ায় কার্বন বেড়েছে। এ তাড়া ট্যাঙ্ক, লরী বিভিন্ন ধরনের যান বাহনের নির্গত ধূঁয়া প্রতিদিন বাতাসে মিশতে এবং এই প্রক্রিয়ায় বিশ্ব ব্যাপী বায়ুমন্ডলে কার্বণ জমতেই থেকেছে। অর্থ হল- গাছপালা কার্বন গ্যাস গ্রহন করে এবং অক্রিজেন ত্যাগ করে। ঠিক মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের উল্টো পদ্ধতি। এখন পৃথিবী ভর প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় যে পরিবেশ ছিল তা গাছপালা নিধনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। অথ্যা কার্বন জমছে তো জমছেই। কমছেনা মোটেই। এই জমা হওয়ার কার্বণ বায়ুমন্ডলে ভাসছে। সূর্যকিরণ পৃথিবীতে আসছে হয় এই বায়ুমন্ডল ভেদ করে। কিন্তু বায়ুমন্ডলে কার্বনের মাত্রা বেশী থাকায় বায়ুমন্ডলকে গরম করছে। এখন এই বাড়তি গরমটা যাবে কোথায়? এই বাড়তি গরমের কারণে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করেছে। সাগরের জল বেড়ে যাচ্ছে। আবহাওয়া গরম হওয়ায় প্রাকৃতিক ভাবে ওলট পালট শুরু হয়েছে। গরম কিন্তু চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়েই চলছে তারপরে পৃথিবীভর নিত্যনতুন কলকারখানা, ইটভাটা, দাবানল ইত্যাদির কারণে বায়ুমন্ডলের ঘণত্ব বাড়ছে আর বাড়ছে তাপমাত্রা।

পৃথিবীর ধনী সম্প্রদায়ের জন্য মানবতার সেবায় অংশীদার হযে নিজেদের মনের প্রসারতা তুলে ধরতে এই জলবায়ু পরিবর্তন একটা মহা সুযোগ এনে দিয়েছে। এই সুযোগ হারানো তাদের উচিত হবেনা।

মন্দাক্রান্ত্ম পুজিঁবাদ এখন কিন্তু ঘৃণিত এক মতবাদ। পৃথিবীর যা ক্ষতি করার টিএনসি এবং কর্পোরেট ব্যবসায়ীরা তা করেছে এবং করে চলছে। পৃথিবীকে ধ্বংস প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসার পর থেকেই তারা বুঝতে পেরেছে পরিণতি কী হতে যাচ্ছে এবং তখন থেকেই অন্ত্মরীক্ষে অভিযান চালানো হচ্ছে ভিন্ন কোন গ্রহে পানির খোঁজ পাওয়া যায় কিনা। মহাকাশ ষ্টেশন তৈরী, সেখানে মাসের পর মাস থেকে অভিযোজন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছে। আরও বেঁচে থাকার কত রকম ফন্দি ফিকিরই না করছে । তার কারণ বৈশ্বিক উষ্ণতার বিষয়টা এখন আর সেই পর্যায়ে নেই যে কোন ফালতু মতবাদ বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলাম। গরমের আচটা ধনী গরিব সবারই গায়ে লাগছে। সুতরাং গণসচেতনতা বাড়াতে বাস্ত্মব ভাবেই উষ্ণায়ন সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু এই উষ্ণায়ণ বা এর প্রতিক্রিয়া প্রভাবের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়ার সাথে জলবায়ু পরিবর্তন গণমানুষের জীবন ধারায় যে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে বা পরিবর্তনের সূচনা দেখা যাচ্ছে তাকে অস্বীকার করে কালক্ষেপন করার সুযোগ বা সময় কোনটাই নেই।

গোটা বিশ্ব, বিবেক সম্পন্ন গণমানুষ, টিএনসি বা কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের মনে প্রাণে ঘৃণা করে। এই ঘৃণিত হবার কারণ তাদের স্বার্থপরতা, ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা যার উপর পুজিঁবাদের ভিত্তি রচিত। ব্যক্তি উদ্যোগ অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু তা হতে হবে সামগ্রিক কল্যানে, যেখানে ব্যক্তির বংশধরদের কল্যানও নিহিত রয়েছে। ব্যক্তি, যে নিজের পরিবারে যেমন দায়বদ্ধ তেমনি সমাজেও সে ততভখানি দায়বদ্ধ।

অধ্যায় ৪

বাংলাদেশে জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় সংহতি সমাজ ব্যবস্থার অপরিহার্যতা



জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সংকটের বর্তমান ক্রান্তিলগ্নে, যেখানে বেঁচে থাকার প্রশ্নটাই প্রকট আকার ধারন করেছে, সেখানে নারী পুরুষের ভেদাভেদের প্রশ্নটা নিতান্তই অবান্তর।

৪. জলবায়ু সংকট মোকাবিলার দৃষ্টিভঙ্গিরঃ মানবিক অভিযোজন

মিডিয়া মাধ্যমে খবর হয়েছে যে পৃথিবীর শীর্ষ ধনীদের মধ্য থেকে জনা ক'য়েক ইতিমধ্যেই তাদের অর্জিত সম্পদের প্রায় সবটাই পৃথিবীর জনকল্যানে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বিষয়টা অবশ্য গুরন্নত্বপুর্ণ। তাদের জীবনের প্রায় শেষাবস্থায় এসে অর্জিত পার্থিব সম্পদ যে ব্যক্তিগতভাবে তাদের যৌবন বা প্রান আবার ফিরে পাবার নয় তা বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু এই বোধ অর্জিত হবার পূর্বেই যে কত নিস্পাপ প্রান বলিদান হয়েছে তার ঐ সম্পদ আহরণ প্রক্রিয়ায়, কত মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে তার হিসাব কে রেখেছে? তবু জীবননের সায়াহ্নে তাদের এই বোধদয় দেখে ভাল লাগছে এ কারণে যে তাদের দেখানো পথ ধরে আরও বহু পথিক যদি নিজেদের নিরাপত্তার সাথে এই পথে চলতে শুরু করে তাহলে তা ভবিষ্যৎ এ কল্যাণকর হবে বলে আশা করা যায়। স্বর্গ ছেড়ে ধরার ধূলায় ফিরে আসতে পারাটা সহজ ব্যাপার নয়। আম জনতার কাতারে সামীল হবার মত মনোভাব গড়তে সক্ষমতা অর্জন সত্যিই প্রশংষনীয় এবং মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ। এ ধরনের শুব সূচনা কল্যাণকর । ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েছেই। তারপরেও এসব মানসিক পরিবর্তন দগ্ধ ঘা যা এর উপর স্বস্দিায়ক মানবিক প্রলেপ হিসেবে কাজ করবে। এ পরিবর্তন জলবায়ু পরিবর্তনের সৃষ্ট সংকট উত্তরণে, প্রশমনে, প্রলেপের কাজ করবে। সময় সংকটাপন্ন হলেও একেবারে বয়ে যায়নি। পৃথিবীর ধনী সম্প্রদায়ের জন্য মানবতার সেবায় অংশীদার হযে নিজেদের মনের প্রসারতা তুলে ধরতে এই জলবায়ু পরিবর্তন একটা মহা সুযোগ এনে দিয়েছে। এই সুযোগ হারানো তাদের উচিত হবেনা। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ধনীদের উচিত হবে তাদের কর্তব্য সর্ম্পকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অভিযোজন ঘটানো। এতে তাদের উপকার হবে তুলনামূলকভাবে অনেক অনেক বেশী পরিমাণে। উপরন্তু জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উষ্ণতা প্রভাবে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনা যেমন সম্ভব হবে, তেমনই সমাজে তাদের মর্যাদাও বেড়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা হবে তাদের পরবর্তী প্রজন্মদের সার্বিক নিরাপত্তা।" বাংলাদেশের মানুষ দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলেও অভ্যন্তরীন ভেদাভেদ ভুলে ঐকবদ্ধ হয়ে যাই। হুজুগপ্রিয় জাতি হিসেবে বসন্তকালীন হৈচৈ যা-ই করিনা কেন, প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করা ছাড়াও নিজ নিজ কর্তব্য বা দায়িত্ব পালনে আমরা পেছপা হবার জাতি নই।

৪.১. জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় সংহতি সমাজ ব্যবস্থার অপরিহাযর্তা

বিশ্বমন্দার আঘাতে পুঁজিবাদ পর্যুদস্ত। এ সময়ের দাবী সংহতি সমাজ ব্যবস্থায় একটা জীবন্ত সংহতি অর্থনীতির অনুকুলে তাদের স্বতস্ফুর্ত অবদান অবশ্যই স্বীকৃতি লাভের আশা করতে পারে এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বৈশ্বিক সংকটে তা খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই সুতরাং, পৃথিবীর এই ক্রান্লিগ্নে সব মানুষের শুভবুদ্ধির উন্মেষ ঘটুক বিকশিত হোক মানবতা। জয হোক মানুষের! মানবতার। সুতরাং পুঁজিবাদ ঠেকাতে ব্যক্তিভিত্তিক ব্যবস্থাপনার বিপরীতে সমষ্টিগতভাবে এবং নিজেদের টিকে থাকার নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে সংহতি সমাজ ব্যবস্থা অপরিহার্য। দুটো বা তিনটে খুঁটি দিয়ে যেমন ঘর তোলা যায় না- সমাজের কল্যাণের প্রশ্নে তেমনি ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে তেমনি সামাজিকভাবে সাবলম্বী হওয়াও দুঃসাধ্য । বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সংকট মোকাবিলায় সামাজিক অংশগ্রহণটা যতটা কার্যকরী হবে ব্যক্তিগত বা এককভাবে তা সম্ভব হবেনা। কারণ এমন সব অপরিচিত সংকট এবং সমস্যা মোকাবিলার সম্ভাবনা রয়েছে যেগুলো এককভাবে সমাধানের কোন সুযোগ থাকবেনা। সুতরাং যেখানে টিকে থাকা বা বেঁচে থাকার প্রশ্ন জড়িত সেখানে ব্যক্তি নিতান্তই অসহায়। ঐক্যবদ্ধ গণ-মানুষ, নিজেদের ব্যাবস্থাপনায়, সমঅধিকারের জ্ঞান সমৃদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সমষ্টিগত ধ্যান ধারনায় উদ্বুদ্ধ, একই ধারনা, চিন্তা চেতনায় অভিন্ন স্বার্থ রক্ষায়, নিবেদিত জনগোষ্ঠি অধ্যুষ্যিত এলাকা ভিত্তিক সম্প্রদায়ই হচ্ছে সংহতি সমাজ। এই সমাজে ব্যাক্তি স্বার্থ, লোভ লালসা প্রাধান্য পাবে না। সমষ্টিগত স্বার্থই এই সমাজের মূলমন্ত্র এবং ভিত্তি। লড়্যা থাকবে ভাবষ্যৎ প্রজন্মদের মঙ্গল বিধান, সমষ্টিগতভাবে।

মানুষের সমাজে, মানুষ জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যুর পরেও পরমুখাপেক্ষি থাকে। জন্ম গ্রহনে প্রয়োজন হয় ধাত্রীর, জন্মের পরে প্রয়োজন হয় গর্ভধারিনী মা এবং প্রকৃতি মা, এই দু মায়ের। প্রকৃতি মা বেঁচে থাকার প্রয়োজনে, শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য দেন বায়ু অন্য মা বুকের সুধায় করেন ক্ষুধা নিবৃত্তি । প্রকৃতি মা তার আলো, বায়ু, জল, ভূমিজাত ফসল, ফল ইত্যাদি দিয়ে শিশুকে বড় করেন। শৈশবে এক

মায়ের কোল ছেড়ে মানুষের মৃত্যুর পর প্রকৃতি মায়ের কোলেই আশ্রয় লাভ ঘটে। তাই উভয় মা'ই সমান মর্যাদার দাবি রাখেন। সে জন্যই বলা হয়েছে "জননী জন্মভূমিশত স্বর্গাদপি গরিয়সী" । "মায়ের পায়ের নিচে বেহেশত (স্বর্গ)", "নিজের মাতৃভূমি বেহেশতের চেয়ে পবিত্র"। সুতরাং মানুষ জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যুর পরেও অপরের মুখাপেক্ষি। এ জন্যেই রক্তের সম্পর্ক বা আত্মার সম্পর্কই যে শুধু আপন জন, তা মনে করার কোন কারণ নেই। সমাজ বদ্ধ সামাজিক প্রাণী হিসেবে, মানুষে মানুষে সবাই প্রিতী বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে চিরদিন, এটাই কাম্য। এই মানুষের সমাজে ভেদাভেদের প্রশ্নই ওঠে না- যেখানে প্রতিটি মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি একই ধরনের। সম মানের। একটা প্রবাদ বাক্য আছে, "অতিমন্দ করঃ শুভ"। মন্দের ভিতরেই নিহিত রয়েছে শুভ। অমঙ্গলের যাবতীয় বাধা বিপত্তির অবসান ঘটিয়ে মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করাই হবে আমাদের লক্ষ্য। আমাদের পবিত্র অঙ্গিকার। মঙ্গলের জন্য, কল্যানের জন্য , সুখের জন্য, শান্তিময় জন্য আমরা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করব। আমরা সেজন্যই অবশ্যই সংহতি সমাজ গড়ার কাজে হাত দিব।

মানুষের মাঝে বিরাজমান আছে শুধু মাত্র দুটো জাতি, একটা হল পুরুষ অন্যটা নারী। নারী পুরুষের অধিকার সমান। বরঞ্চ পুরুষের তুলনায় নারী জাতির অধিকারের প্রশ্নে কিছু বেশি পাওনা আছে তাদের। কিন্তু পাওনা তো দূরের কথা। নারী জাতিকে অধিকার বঞ্চিত করে রাখা হয়েছেকবে থেকে তার হদিস পাওয়া মুশকিল। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত চরম সংকট কালে নারী সম্পর্কিত আলোচনা হয়তো অনেকেরই মনে হতে পারে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু বিষয়টা মোটেই তা নয়। পৃথিবীর ইতিহাসের এই ক্রান্তিলগ্নে, যেখানে বেঁচে থাকার প্রশ্নটাই প্রকট আকার ধারন করেছে, সেখানে ভেদাভেদের প্রশ্নটা নিতান্তই অবান্তর। প্রকৃতির বিধি বিধান, নিয়ম কানুন অমান্য করে চলার কারনে আজ পৃথিবীতে নেমে আসছে চরম পরিণতির পূর্বাভাসগুলো। মহা সংকটময় বিপর্যয় আকারে। এ কথাগুলো বলা হচ্ছে এ কারনে যে জলবায়ু পরিবর্তনের সূত্র ধরে যে সব পরিকল্পিত কর্মকান্ডের সূচনা করা হয়েছে, বা উদ্ভুত সমস্যাবলী সমাধানের এবং সংকট নিরসনে পরিকল্পনার বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে তার মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে গণমানুষের সম্পৃক্ততা। দুটো জাতি পুরুষ এবং নারী উভয় জাতি সমন্বয়ে গঠিত গণমানুষের সম্পৃক্ততার প্রয়োজন। এই গণমানুষের সম্পৃক্ততায় পরিচালিত সাংসারিক, সামাজিক, জাগতিক কর্মকান্ডে নেপথ্য শক্তি হিসেবে কাজ করে চলছে নারী জাতি। সৃষ্টির সময় থেকেই এই নেপথ্য শক্তি সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছে নতুন নতুন রূপে। এ কথাগুলো বুঝতে হবে। বুঝতে হবে হৃদয় দিয়ে।

৪.২. মানবিক এবং পরিবর্তিত জীবন যাত্রা নির্বাহে প্রয়োজন সংহতি সমাজ ব্যবস্থা

জলবায়ু পরিবর্তন বা বৈশ্বিক উষ্ণতা পৃথিবীর অগনিত মানুষের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। পরিবর্তন ঘটছে আর্থ সামাজিক সহ আরও অনেক ক্ষেত্রে। মানুষ পরিবর্তনের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে নতুন এবং পরিবর্তিত জীবন যাত্রা নির্বাহে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এই খাপ খাইয়ে নেবার কাজটা যে স্বেচ্ছায় করা হয়েছে তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ভাবেই খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে। কারণ পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো ছাড়া তাদের কোন গত্যন্তর ছিল না। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের জের হিসেবে আমাদেরও তাই করতে হচ্ছে, বাধ্য হয়েই। আমাদের সবকিছুতে পরিবর্তন ঘটানো ছাড়া আমাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম।

আমাদের নিজেদের চিন্তার তুলনায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের জন্য চিন্তা ভাবনা আমাদের কাছে অনেক বড়। প্রজন্মদের সার্বিক কল্যাণ কামনায়, তাদের জীবন যাত্রা নির্বাহে একটা শান্তিময়পূর্ণ পরিবেশ তৈরী করতে হলে, আমাদের যদি কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তা করতে আমরা প্রস্তুত আছি। সুতরাং যে কোন ধরনের পরিবর্তন সাধনে আমরা যথা সাধ্য চেষ্টা চালাবো। আমরা বর্তমানে যে দুর্দশা ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছি তা যেন আমাদের বংশধরদের করতে হয়না। আমাদের সবারই তো এই কামনা। এই আশা। এই আকাঙ্খা। আমাদের এই **আশা আকাঙ্খার উদ্যম উদ্যোগ নিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের জন্য গড়ে তুলবো এক সুন্দর ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থা এবং এই সমাজ ব্যবস্থাই হচ্ছে সংহতি সমাজ**। গণমানুষের গড়া ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে, নির্বিঘ্ন করতে, নিরঙ্কুশ শান্তিময় আবহ সৃষ্টির লক্ষ্যে, আমরা যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। যাদের ত্যাগ স্বীকার করার মত মনোভাব আছে তারা দরিদ্র নয়। তাই আমরাও দরিদ্র নই। ত্যাগ স্বীকারের মনোভাব আমদের আছে।

যারা ত্যাগ স্বীকার করতে পারেনা, তারা দরিদ্র, চরম অভাবী। তাদের বলা হয় ধনী। কারণ কোনদিনও তারা স্বার্থত্যাগ করতে পারেনা। তাদের চাহিদা কোনও দিন মেটেনা। টাকা পয়সা ধন দৌলত তাদের যতই থাক না কেন তাদের চাহিদার শেষ নেই। তারা, ধনীরা, মনে প্রাণে অভাবী, দরিদ্র এবং লোভী। সেজন্যই তাদের ধনী বলা হয়। তারা লোভ, লালসার ক্রীতদাস। মানব কুলের ঘৃণ্য প্রজাতি। আমরা দরিদ্র নই এ কারণে যে স্রষ্টা প্রদত্ত দৈহিক শক্তি আছে আমাদের। আমরা গতর খাটিয়ে, পরিশ্রম করি। আমরা রুজি রোজগার করি। আমরা অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে জানি। নিতান্তই প্রয়োজনের বেশী আমাদের চাহিদা নেই। তাই আমরা পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে যেমন অভ্যস্ত আছি, ঠিক তেমনই ভাবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট মোকাবিলায়ও আমরা খাপ খাইয়ে নিতে পারছি।

প্রকৃতপক্ষে মানবিক গুনাবণী সমৃদ্ধ জীবনাদর্শ ছাড়া মানুষ হিসেবে, সৃষ্টির সেরা প্রাণী হিসেবে পরিচিতি প্রদানের সুযোগ থাকেনা। বর্তমানে প্রচলিত পুজিঁবাদী অর্থনীতির ছোবলে যে বিষক্রিয়ার উদ্ভব ঘটেছে তা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। কারণ অনেক আদর্শ, ন্যায় নীতির অপমৃত্যু ঘটেছে এই অর্থনীতির আওতায় লঙ্ঘিত হচ্ছে মানবাধিকার। স্বার্থ সংশিস্নষ্ট কুনীতির ফলে ঘোলা করা হয়েছে অনেক জল। মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে অকল্পনীয়ভাবে। জনগণতান্ত্রিকতার মূল লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ এর প্রবক্তারা। পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে গণতন্ত্রের আসল রূপ। “জোর যার মুলস্নুক তার” , ”টাকা আছে যার- পৃথিবীটা তার,” ”পৃথিবীটা পণ্য-মানুষ নগণ্য” এ জাতীয় মূল অপমন্ত্রে, কুমন্ত্রে দীক্ষিত বর্তমান সময়টা। তাই বঞ্চিত নিপীড়িতদের দীর্ঘশ্বাস, পুঞ্জিভূত ক্ষোভ দানা বেঁধে, জমাট বেঁধে রূপ নিচ্ছে অপ্রাকৃতিক দূর্যোগ আর বিপর্যয়ে। কথাগুলো নিতান্তই অমূলক ভাবার সময়টা পার হয়ে গিয়ে আমরা এমন একটা সময়ের মুখোমুখি হতে বাধ্য হচ্ছি যার কারণ অন্যায়ের প্রশ্রয়, মেনে নিতে বাধ্য করা অবিচার। ন্যায় এবং অবিচার যেখানে স্বচ্ছতা হারায় সেখানে কল্যাণ টিকে থাকতে পারেনা। শান্তিস্নও পালিয়ে যায়।

মানুষ-অবয়বে মানবিক গুনাবলী না থাকলে সেই অবয়ব অর্থহীন, নিস্ফল, মানে তার জন্মটাই বৃথা। পলিট্রিক্স এখন আর পলিট্রিক্স নেই। রাজযোগ্যনীতি এখন হয়েছে কু আর অপ এর সমাহার। পলিটিক্স এখন পলিট্রিক্স হয়ে গিয়েছে ঠকানোনীতি। ঠকানোর প্রশ্ন উঠে পার্থিব স্বার্থান্ধতার কারনে, যা সাধারণ মানুষের জন্য মঙ্গল বয়ে আনে না। সুতরাং বর্তমান সময়ে, বৈশ্বিক উষ্ণতা আর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকটময় সময়ের জন্য ”আদর্শ-চরিত্রবান, মানবিক গুনাবলী-সমৃদ্ধ, নিঃস্বার্থভাবে সমাজ সেবার মনমানসিকতা সম্পন্ন, নিজের মাতৃভূমির কাছে কৃতজ্ঞ, স্বদেশ প্রেমী নেতৃত্ব প্রয়োজন, যিনি তার অনুসারীদের পরোপকারে উৎসর্গ হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন। তার আর্দশে অনুপ্রাণিত অনুসারীগণের নিকট মানুষ শুধু মানুষ রূপেই পরিচিতি পাবে। যেখানে থাকবেনা কোন ভেদাভেদ, ছোট বড় বা শ্রেনী বিভক্তি। অনুসারীদের থাকবেনা স্বার্থ নিয়ে ঝগড়া, মনোমালিন্য, যা সমাজে প্রতিফলিত হয়। তাদের স্বার্থ ত্যাগ, আত্ম ত্যাগের বিনিময়ে তারা যে আত্মতৃপ্তি লাভ করবে তা অপার্থিব। সে সন্তুষ্টি বাজারে কেনা বেচাঁ পণ্য নয়। সেই মানসিক সন্তুষ্টি স্বর্গীয় আনন্দে পরিপূর্ণ। অনাবিল পরোপকার মনোবৃত্তি সম্পদ অতুলনীয়, অমূল্য সম্পদ। যে সম্পদে বর্তমান প্রজন্ম এবং ভবিষ্যৎ এর প্রজন্মসমূহ সত্যিকার মানুষ অবয়বে মানুষ রূপে নিজেদের পরিচিতি প্রদানে গর্ববোধ করবে। বর্তমান কুক্ষনের ভিতর থেকে সেই ”শুভ ” আর্বিভূত হোক।

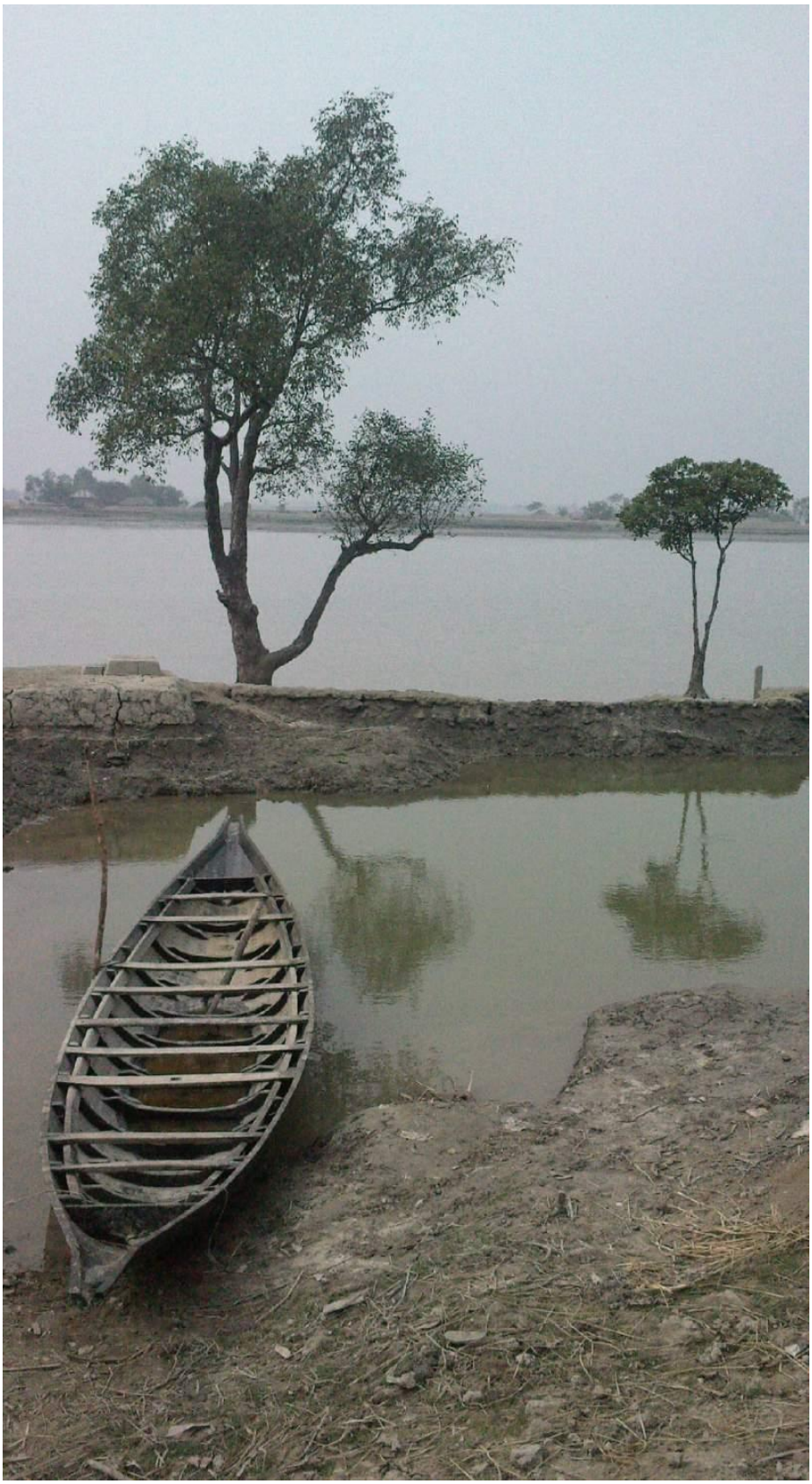
বৈশ্বিক উষ্ণতায় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সংকট-সমস্যাবলীর কারনে সংহতি সমাজ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে চলছে। এ বিষয়টা কোন তত্ত্ব কথা নয়। কারও ব্যাক্তিগত অভিপ্রায় প্রসুত তাত্বিক বিষয়ও নয়। কোন সরকারের নীতি সংবলিত, জনগনের উপর চালিয়ে দেওয়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত ও নয়। বিষয়টা সুস্পষ্ট ভাবেই নিজেদের প্রযোজনের তাগিদেই, পরিস্থিতির সাথে নিজেদের খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজনের তাগিদেই জনগণ স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে সংহতি সমাজ গড়ে তুলতে বাধ্য হচ্ছে,আত্মরক্ষায়, এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে । কারণ সংহতি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়া তাদের সামনে বিকল্প কোন পথ খোলা নেই।

সংহতি সমাজ শ্রেনীহীন মানুষের একটা সমাজ। এ সমাজে ধনী, নির্ধন, বুদ্ধিজীবি বা অর্ধাচীন, কোন ভেদাভেদ নেই। ভেদাভেদ থাকারও কোন কারণ নেই। বাচঁতে হলে এবং বাচাঁতে হলে সবাইকে"খরার ধূলায়" নেমে আসতে হচ্ছে। প্রধান কারণ হল বৈশ্বিক উষ্ণতা আঁচটা সবার শরীরেই সমানভাবে অনুভূত হওয়ার কথা। সুতরাং এই বৈশ্বিক উষ্ণতা বা জলবায়ু পরিবর্তন যখন পাইকারী হারে সবাই অনুধাবন করছেন তখন উপরে যারা আছেন বলে মনে করেন তাদের উচিত হবে নীচে নেমে এসে নীচের লোক গুলোর সাথে একাত্মতা ঘোষণা না করেও কাজে নেমে পড়া। অবস্থাটা বিশেষ ভাল নয়। কারোরই অনুকূলে নয়।

বৈশ্বিক উষ্ণতায় গোটা পৃথিবীব্যাপী যে বিপর্যয় শুরু হয়েছে তাতে অমরা, বাংলাদেশের সাধারণ গণমানুষেরা, যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায়, আমরা অভ্যস্ত্ম থাকার কারনে যে কোন বিপর্যয়ে খাঁপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা আমাদের আছে। সুতরাং খাপ খাইয়ে নেবার প্রয়োজনের প্রশ্নে আমরা বিশ্ববাসী নেতৃত্ব আছি। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট মোকাবেলায় আমরা অগ্রসর অবস্থায় আছি। ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশের অবস্থান এমনই যে আমরা প্রাকৃতিক দূর্যোগুলোর আঘাতের পর আঘাত সইয়ে নিচ্ছি। তাই আমাদের সাহস, শক্তির কমতি নেই। আর এই জন্যই জলবায়ু পরিবর্তনের তীব্রতা ঠেকাতে, সেই অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে, সংহতি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতেও আমাদের অসুবিধা হবেনা।

জীবন জীবিকার উন্নয়নমূলক নীতির সাথে জাতীয় নীতিমালার অভিযোজনের প্রয়োজন রয়েছে। দরিদ্র-বান্ধব জলবায়ু সুশাসনের খাতিরেই এটা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। উন্নয়ন কর্মকান্ড প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতার দায়ভার চাপিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হলে চলবেনা, বরং উন্নয়ন কর্মধারায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের বিষয়টাও সুনিশ্চিতভাবে সুরক্ষিত করতে হবে। সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা একক ভাবে জলবায়ু সংকট নিরসনে সাফল্য লাভ করবে, এমনটা আশা করা সমীচিন নয়। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টাই ব্যাপকতা ভিত্তিক। সে ক্ষেত্রে একক প্রচেষ্টা যতই নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত হোক না কেন ব্যাপকতার আঘাতে সে পরিকল্পনা সীমিত রাখা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

শান্তিস্মপূর্ণ পরিবেশ ছাড়া মানুষের মানবিক, দৈহিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক শৈল্পিক ইত্যাদি কোন কিছুই উন্নয়ন সম্ভবপর হয় না। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য, মানবিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ একটি শান্তিস্মপূর্ণ পরিবেশ চাই। বিশ্বের দরিদ্র এবং প্রান্তিস্মক জনগোষ্ঠীর জন্য, মানব সমাজের জন্য এই পৃথিবীটায় শান্তিস্ম বিরাজ করা অপরিহার্য।



অভাবী অর্বাচীন

বি. আর খান

পৃথিবী যাদের হাতের মুঠোয়
ক্রিকেট বলের মত,
পৃথিবী তাদের বলের প্রতীক
লাথিখেতে অবিরত।

নিখুঁত তাদের পরিকল্পনায়
গড়া যে আকাশ যান,
তাও জ্বলে গেল পথ পাড়ি দিতে
তবু নয় সাবধান ।

খাহেশ তাদের বড় বিদঘুঁটে
শূন্যে বাঁধিবে ঘর।
“দুনিয়যর সব যাক মরে যাক,
তারাই রবে অমর!”

কোথা থেকে এলো, ফের যাবে
কোথা
অজানা যাদের কাছে।
গ্রীণ হাউস গ্যাস তাদেরই সৃষ্টি,
ব্যবসাতে তারা আছে।

মুনাফা লুটের অতি উৎসাহে
পৃথিবীকে দিয়ে বলি,
অতি মানবের ভূমিকায় নেমে
রসাতলে গেল চলি।

পুঁজি বাজারের ফুরিয়েছে তেল
গতি হয়ে এল মন্দা,
ইতিহাস বলে-‘অনাচার হলে’
ঘনায় নারকী সন্ধ্যা।



